দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

ভারতীয়ত্ব, হিন্দুত্ব এবং রাষ্ট্রচিন্তা
পৃঃ - ১২

অভদ্র প্রতিবেশী থাকলে চিরাচরিত প্রথার বাইরে গিয়ে সমাধান খুঁজতে হবে
পৃঃ - ২৭

৬৯ বর্ষ, ৪ সংখ্যা।। ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬।। ২ আশ্বিন - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৮।। website : www.eswastika.com ।।

উস্কে দিল সত্তরের দশকের স্মৃতি

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাঙ্গনে চরম নৈরাজ্য

ভাবতে পারছি না, কলেজে ঢুকে কেউ এভাবে কোনো শিক্ষকের মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ধরতে পারে।
চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য
অধ্যক্ষ, শান্তিপুর কলেজ

খুব আতঙ্কিত হয়েছিলাম। অধ্যক্ষের ঘরে গিয়ে যখন ওঁকে জানাচ্ছি, ওরা ঢুকে তাঁকেও হুমকি দিতে থাকে।
অমরজিৎ কুণ্ডু
আক্রান্ত শিক্ষক

পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি রাজনীতির আখড়া হয়ে উঠেছে।
কেশরীনাথ ত্রিপাঠী
রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৯ বর্ষ ৪ সংখ্যা, ২ আশ্বিন, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

১৯ সেপ্টেম্বর - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ■ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ■ ৬-৯

পাকিস্তানকে শিখণ্ডী করে ভারতকে বিপাকে ফেলতে চাইছে চীন ■ গূঢ়পুরুষ ■ ১০

খোলা চিঠি : মদনদাদা, মদনদাদা, তোমায় দেখতে যাব... ■ সুন্দর মৌলিক ■ ১১

ভারতীয়ত্ব, হিন্দুত্ব এবং রাষ্ট্রচিন্তা ■ সঞ্জয় সোম ■ ১২

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা— নৈরাজ্যের দিগ্‌বলয় ■ ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস ■ ১৫

অদ্ভুত অন্ধকারে এক মুঠো জোনাকি ■ শিবশম্ভু পাল ■ ১৮

জাতিপ্রতিমা দুর্গা ■ অমিত ঘোষদস্তিদার ■ ২১

হিন্দুধর্মের সম্প্রদায় ভেদ ■ রবীন সেনগুপ্ত ■ ২৩

অভদ্র প্রতিবেশী থাকলে চিরাচরিত প্রথার বাইরে গিয়েই সমাধান খুঁজতে হয় ■ চেতন ভগত ■ ২৭

অভ্যন্তরীণ জলপথকে সুপরিকল্পিতভাবে কাজে লাগাতে চায় মোদী সরকার ■ দিব্যজ্যোতি চৌধুরী ■ ২৯

গুরু পরম ব্রহ্ম ■ শেখর সেনগুপ্ত ■ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ■ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ■ **অঙ্গনা : ২৬** ■ **অন্যরকম : ৩৩** ■ **সুস্বাস্থ্য: ৩৫-৩৬** ■ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৭-৩৯** ■ **শব্দরূপ : ৪৯** ■ **চিত্রকথা : ৪১**

স্বস্তিকা

আগামী ২৬ সেপ্টেম্বরের সংখ্যাই

পূজা সংখ্যা

দাম ৭০ টাকা।। সত্বর কপি সংগ্রহ করুন

স্বস্তিকা

আগামী ৩ অক্টোবর সংখ্যার আকর্ষণ

মাতৃরূপেণ সংস্থিতা

লিখেছেন : বিষ্ণুপুরীজী মহারাজ, স্বামী সুনিশ্চিতানন্দ।

স্বস্তিকা দীপাবলী সংখ্যা

প্রকাশিত হবে ২৪ অক্টোবর, ২০১৬

পঞ্চসাধকের কালি-সাধনা

লিখেছেন : স্বামী বেদানন্দ, ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত, সন্দীপ দাঁ, উজ্জ্বল মণ্ডল প্রমুখ।

দাম : ১০০ টাকা। কপি বুক করুন।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বিচ্ছিন্নতাপন্থী উগ্রবাদীদের প্রতি কেন এই উদারতা?

হিজবুল কমান্ডার বুরহান ওয়ানির মৃত্যুর পর থেকেই অশান্ত কাশ্মীর। প্রায় দুই মাস পার হইয়া গেল। ইতিমধ্যে দুই পুলিশকর্মী-সহ নিহত হইয়াছেন ৭৬ জন। পুলিশ-জনতা সংঘর্ষে আহতের সংখ্যা হাজার ছাড়াইয়াছে। উপত্যকায় লাগাতার বনধ্ চলিতেছে। সমগ্র কাশ্মীরে একই ছবি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখিতে জারি হইয়াছে কার্ফু। এমনকী ইদের দিনেও। উপত্যকায় উত্তেজনা প্রশমনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ হইতে নানাভাবে চেষ্টা চলিতেছে। সর্বদলীয় বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবের ভিত্তিতে একটি সংসদীয় দল জম্মু-কাশ্মীরে পাঠানো হইয়াছিল। কিন্তু বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতারা ওই দলের সঙ্গে দেখা করিবার মতো সৌজন্যটুকুও দেখায়নি।

কাশ্মীরে এমন অশান্তি দেখা গিয়েছিল ২০১০ সালে। কিন্তু তখনও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের এমন উগ্রতা প্রকাশ্যে দেখা যায় নাই। নিরাপত্তারক্ষীদের উপর প্রতিদিন আক্রমণ এবং পাকিস্তানের পতাকা ওড়ানো হয় নাই। এই পরিবর্তন লক্ষণীয়। মধ্যবর্তী এই কালখণ্ডে বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী স্থানীয় যুবকদের বিভ্রান্ত করিয়াছে। পিডিপি-বিজেপি জোট সরকার গঠিত হইবার পর আশা করা হইয়াছিল, জম্মু-কাশ্মীরের অবস্থার পরিবর্তন হইবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। ওয়ানির মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়া কাশ্মীর উপত্যকা আবার অশান্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতেই স্পষ্ট উগ্রবাদীরাই এই অশান্তির মূলে। কিন্তু ইহার নেপথ্যে রহিয়াছে ইসলামি মৌলবাদী তত্ত্ব। পাক-বিচ্ছিন্নতাবাদী তত্ত্বে বিশ্বাসী মসজিদের তথাকথিত ইমামরাই কলকাঠি নাড়িতেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঠিকই বলিয়াছেন, কাশ্মীরের সমস্যার মূলে ইসলামি উগ্রবাদ এবং ইহার মদতদাতা পাকিস্তান।

কিন্তু ইহার আরও একটি দিকও রহিয়াছে। একদিকে পাকিস্তানকে যখন দায়ী করা হইতেছে, অন্যদিকে তখন উগ্রপন্থীদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাও দেওয়া হইতেছে। রাষ্ট্রীয় সুরক্ষাবাহিনী (এন এস জি)-র সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুসারে সরকারি অর্থের মদতেই উগ্রবাদীদের শক্তি বাড়িতেছে। গত ৩৫ বছরে ওই বিচ্ছিন্নতাবাদী উগ্রপন্থীদের হাতেই ৫৪৬২ জন নিরাপত্তাকর্মী ও ১৬,৭২৫ জন নিরীহ নাগরিক নিহত হইয়াছেন। অশান্ত কাশ্মীরে পুলিশবাহিনীকে মদত দেওয়ার জন্য সুরক্ষা সম্পর্কিত (এস আর ই-পি) এবং উপত্যকার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের (এম আর আর ই-আর আর) জন্য দুইটি যোজনায় যথাক্রমে ৪৭৩৫ ও ২৪৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। কিন্তু ঘটনা হইল, যাহাদের জন্য বরাদ্দ তাহাদের পরিবর্তে এই অর্থ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের 'জেড' শ্রেণীর সুরক্ষা, পাঁচতারা হোটেলে তাহাদের অফিস ও বাসস্থানের সুবিধা, বিদেশযাত্রা ও বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য ব্যয় করা হইতেছে। এইসব বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশিত হইবার পরও সরকারের নীরবতা প্রশংসার দাবি রাখে না। সরকারি সুবিধাপ্রাপ্ত এইসব বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের মধ্যে রহিয়াছে মিরওয়াইজ উমর ফারুক, ইয়াসিন মালিক, সৈয়দ আলিশাহ গিলানি এবং হিজবুল প্রধান সৈয়দ সলাহউদ্দিন—যাহার তিন পুত্রই সরকারি চাকুরি করিতেছে।

দেশের সর্বোচ্চ আদালত ২০১৩ সালে এক ঐতিহাসিক রায়ে ঘোষণা করিয়াছেন, দেশের সকল নাগরিকই সমান, তাই ভিআইপি-সংস্কৃতি শীঘ্রই বন্ধ হওয়া উচিত। এই রায়ের পরও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের জন্য বণ্টিত ৫০০ ঘর ছাড়িয়া দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। কাশ্মীরে অশান্ত পরিস্থিতির জন্য দুই মাসে ৬৪০০ কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে। অন্য রাজ্যের তুলনায় জম্মু-কাশ্মীরে কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ আটগুণ অধিক। রাজ্যের উন্নয়নের জন্য— শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ হইয়াছে, তাহা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সুবিধাভোগের জন্য ব্যয় করা হইতেছে। বিচ্ছিন্নতাপন্থী উগ্রবাদীদের প্রতি কেন এই উদারতা?

সুভাষিতম্

অনাহূতঃ প্রবিশতি অপৃষ্টো বহু ভাষতে।
অবিশ্বস্তে বিশ্বসিতি মূঢ়চেতা নরাধমঃ।।

বিনা আহ্বানে কোথাও প্রবেশ করা, বিনা জিজ্ঞাসায় অনর্গল বক্তব্য রাখা, অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে বিশ্বাস করা—এ সবই মূর্খের লক্ষণ।

বকরিদে হিন্দু-নিধনের পরিকল্পনা ধোলাহাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কালিয়াচকের পুনরাবৃত্তি ধোলাহাটে। বকরিদ উপলক্ষে শুধু গোরু কেটেই এ রাজ্যের মুসলমানদের আর সন্তুষ্ট রাখা যাচ্ছে না। মমতা-সরকারের মুসলমান তোষণ নীতি কোন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে, গত ৩ জানুয়ারি কালিয়াচকের ঘটনার পর তা আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল গত ১১ সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ধোলাহাটে। কালিয়াচকের ঢঙেই প্রায় হাজার তিনেক সশস্ত্র মুসলমান হামলা চালাল ধোলাহাট থানায়। ভাঙচুর, লুঠপাট, নথিধ্বংস ইত্যাদি তো চলেই। মমতা সরকারের নীতিবাক্য মেনে পুলিশকর্মীরা তখন গান্ধীগিরিতে ব্যস্ত। পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তাদের হালও তখন 'পিঠে বেঁধেছি কুলো, কানে গুঁজেছি তুলো'। নিজেকে বাঁচাতে মরিয়া পুলিশ যখন অগত্যা বন্দুক হাতে নিতে বাধ্য হলো তখন গুলি লাগল উন্মত্ত দুষ্কৃতীদের মধ্যে একজনের গায়ে। ফলত হামলার আকার আরও হিংস্ররূপ ধারণ করে। তারপরে হামলাকারীরা প্রত্যেকেই শাসকদলের ছত্রছায়ায় থাকায় এবং আক্রান্তেরা বিরোধী শিবিরের হওয়ায় ঘটনাটিকে রাজনৈতিক রঙ দিতে প্রশাসন ও শাসকদল উভয়েরই সুবিধে হয়ে গিয়েছে।

থানা ভাঙচুরের পরেই মুসলমান দুষ্কৃতীরা রীতিমত শাসানি দিয়ে হিন্দুদের বলে— 'বকরিদে প্রথমে গোরু কাটব, তারপর তোদের।' এই ধরনের হুমকির পরেও প্রশাসনের তরফে কোনো হেলদোল নেই। এই প্রতিবেদন লেখার সময় অবধি বকরিদের আগের রাত্রে গভীর আশঙ্কা ও চরম উদ্বেগের মধ্যে কাটাচ্ছেন এলাকার হিন্দুরা। ঘটনার সূত্রপাত গত ৪ সেপ্টেম্বর। রামচন্দ্রপুর (ভজনা) গ্রাম থেকে তিন কিলোমিটার দূরে লক্ষ্মীনারায়ণপুরে খুন হন গবাদি পশু ব্যবসায়ী ধোলাহাটের বাসিন্দা রউফ মোল্লা। ব্যবসায়িক রেশারেশির জেরেই তিনি খুন হয়েছেন বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান।

কিন্তু মুসলমান-অধ্যুষিত এলাকার মুসলমান বাসিন্দার দেহ পাওয়া যাচ্ছে হিন্দু-প্রধান এলাকায়, এই সুযোগ নিতে মুসলমানরা দেরি করেনি। ঘটনার পর থেকেই হিন্দুপ্রধান ভজনা, রামচন্দ্রপুর, বেনেপাড়া, মন্দিরতলা, নিশ্চিন্দপুর, জামাই লস্কর বাজার প্রভৃতি এলাকায় হিন্দু বাড়িগুলিতে লুঠতরাজ, মায় মা-বোনেদের সম্মান ধরেও টানাটানি করে মুসলমানরা। পুলিশের কাছে গেলেও লাভ বিশেষ কিছু হয়নি। উপরন্তু পুলিশের তরফ থেকেও হিন্দুযুবকদের হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ। রামচন্দ্রপুরের ভজনা ও জামাইলস্কর বাজারের বেনেপাড়ায় মুসলমান দুষ্কৃতীদের হুমকির মুখে গত ৬ সেপ্টেম্বর থেকেই দোকানে দোকানে ঝাঁপ গোটাতে বাধ্য হয় হিন্দুরা। সুন্দর দেবাশ্রম, কানাই মণ্ডল-সহ বিভিন্ন দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়। গত ৮ তারিখে হিন্দুদের একাধিক দোকান লুঠও করে মুসলমান দুষ্কৃতীরা। আর পুলিশকে ভয় পাইয়ে দেওয়া হামলাটি হয় গত ১১ তারিখ। আপাতত বকরিদে হিন্দু-কোরবানির অপেক্ষায় ধোলাহাটের মুসলমানরা।

বলা বাহুল্য, এতবড় কাণ্ডের পরও সেকুলারিজমের ধ্বজাধারী বুদ্ধিজীবীমহল ও সাংবাদিককুল নিশ্চুপ। তারা যেন আর পাঁচটি রাজনৈতিক হামলা আর মারামারির সঙ্গে বিষয়টিকে এক করে ফেলতে পারলেই বাঁচেন। কিন্তু তথ্যাভিজ্ঞমহল স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, কালিয়াচকের প্রতিক্রিয়া কিন্তু ভোটে বৈষ্ণবনগরে পড়েছিল আর ধোলাহাটের প্রতিক্রিয়ায় গোটা বাংলাই একদিন কেঁপে উঠবে না তো?

দেশের দশটি স্বচ্ছতম জেলার তিনটি বাংলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ স্বচ্ছ ভারত অভিযানের প্রথম দফার ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। সমতল ভূমিতে অবস্থিত দেশের স্বচ্ছতম দশটি জেলার তালিকায় মহারাষ্ট্রের পাঁচটি এবং পশ্চিমবঙ্গের তিনটি জেলা স্থান পেয়েছে। প্রথম দফার সমীক্ষার জন্য সারা দেশে মোট ৭৫টি জেলার গ্রামীণ এলাকাগুলি বেছে নেওয়া হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হিমাচল প্রদেশের মাণ্ডি পেয়েছে স্বচ্ছতার পরীক্ষায় প্রথম স্থান। তারপরেই আছে মহারাষ্ট্রের সিন্ধুদুর্গ।

নিকাশি মন্ত্রকের তরফে কোয়ালিটি কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া সমীক্ষাটি পরিচালনা করেছে। সমীক্ষার জন্য কাউন্সিলের বিশেষজ্ঞরা সারা দেশে ২৫৩০টি গ্রামের ৭০০০০ বাড়ি পরিদর্শন করেন। তাঁরা রিপোর্ট দেবার পর কেন্দ্রীয় জলসম্পদ ও নিকাশি মন্ত্রক ফলাফল ঘোষণা করে। সমীক্ষায় জেলাগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল— উত্তরপূর্বাঞ্চল এবং পাহাড়ি রাজ্যের গ্রাম এবং সমতলভূমির গ্রাম। ৭৫টি জেলার মধ্যে হিমাচল প্রদেশের মান্ডি ৯৮.৪ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান পায়। ৯৬.৮ নম্বর পেয়ে মহারাষ্ট্রের সিন্ধুদুর্গ হয়েছে দ্বিতীয়। তিন মাস ধরে চলা সমীক্ষায় কয়েকটি মাপকাঠিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে শৌচালয় নির্মাণ ও ব্যবহার, উন্মুক্ত স্থানে মলমূত্র ত্যাগের প্রবণতা কম করা, যেসব জায়গায় জনসমাগম বেশি হয় সেই জায়গাগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে সচেতনতা এবং বৃষ্টির জল জমিয়ে রাখার কুঅভ্যাস।

ডেঙ্গু-প্রবণ রাজ্য বলে পরিচিত পশ্চিমবঙ্গে স্বচ্ছ ভারত অভিযানে ভালো সাড়া মিলেছে। প্রথম দশ জেলার মধ্যে রয়েছে নদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর এবং হুগলি। প্রকল্পের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত জলনিকাশি মন্ত্রকের সচিব পরমেশ্বরন আয়ার বলেন, 'আমরা শুধু শৌচালয় নির্মাণ আর ব্যবহার দেখে শংসাপত্র দিইনি, স্বচ্ছতার যতগুলি মাপকাঠি হওয়া সম্ভব আমরা তার প্রত্যেকটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছি।'

হিন্দুদের এখন রুখে দাঁড়ানোর সময় এসেছে : সুরেন্দ্র জৈন

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সংখ্যালঘু হয়ে পড়ার পর মুসলমানদের ভয়ে উত্তরপ্রদেশের কইরানা থেকে হিন্দুদের পলায়ন সারা দেশকে একটা প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ভারতের মাটিতেও কি হিন্দুরা একদিন উদ্বাস্তু হবে? সম্প্রতি মহাজাতি সদনে এই প্রশ্নটি নিয়ে বসেছিল আলোচনা সভা। উদ্যোক্তা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সর্বভারতীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. সুরেন্দ্র জৈন, কার্যকর্তা জগন্নাথ সাঁই, সাপ্তাহিক বর্তমান পত্রিকার সম্পাদক রন্তিদেব সেনগুপ্ত, লেখক মোহিত রায়, ১০৮ মহামণ্ডলেশ্বর বিশোকানন্দজী মহারাজ, স্বামী বন্ধুগৌরবজী প্রমুখ।

মঙ্গলদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে সভার শুভারম্ভ করেন বিশোকানন্দজী মহারাজ। মুসলমানদের আক্রমণাত্মক জনসংখ্যা নীতির ফলে ভারতের জনবিন্যাসের চেহারা আজ যে অবস্থায় পৌঁছেছে তার পরিণতি কী হতে পারে ব্যাখ্যা করে জগন্নাথ সাঁই বলেন, একটা দেশের নিয়তি কেমন হবে তা নির্ভর করে সেই দেশের জনবিন্যাসের ওপর। এক সময়ে ভারতের সীমা ইরান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উত্তরে তা ছড়িয়ে পড়েছিল চীনের কিয়দংশ অবধি। ইসলামি এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন, দেশভাগ ইত্যাদির ফলে ভারতের ভৌগোলিক সীমা বারবার সঙ্কুচিত হয়েছে। এমনকী, যে সিন্ধুনদ থেকে 'হিন্দু' নামের উৎপত্তি সেই নদও এখন ভারতের বাইরে। ইসলামি জঙ্গিবাদ এখন ভারতকে আরও ছোট করতে চাইছে। তার জন্য জগন্নাথবাবু হিন্দুদের একত্রিত হবার আহ্বান জানান।

লেখক মোহিত রায় স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন ভারতে হিন্দুদের উদ্বাস্তু হওয়া আর আগামীকালের বিষয় নয়, ইতিমধ্যেই তা শুরু হয়ে গিয়েছে। উদাহরণ কাশ্মীর। তাছাড়া ভারতের কয়েকটি রাজ্যের কিছু কিছু জেলায় হিন্দুরা জনসংখ্যার বিচারে সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছে। কইরানার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তালিকায় রয়েছে বিহারের পূর্ণিয়া কাটিহার অররিয়া দ্বারভাঙ্গা, পশ্চিমবঙ্গের মালদা, মুর্শিদাবাদ উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তরপূর্বাঞ্চলের করিমগঞ্জ হাইকালান্দি ধুবড়ি বরপেটা গোয়ালপাড়া, তামিলনাড়ুর তঞ্জাবুর রামনাথপুরম, কেরলের কোঝিখোড় মল্লাপুরম এবং কাসরগোড়। মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির নীতি ঠিক কতটা ভয়াবহ তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মোহিতবাবু বলেন দশ বছর আগেও বসনিয়ায় মুসলমানরা ছিল ৪০ শতাংশ। এখন দেশটা ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যা কমাতে অনুপ্রবেশ বন্ধ করার ওপর জোর দেন মোহিতবাবু। অসমের মতো এ রাজ্যেও ডি-ভোটার লিস্ট চালু করার দাবি জানান। সেই সঙ্গে সন্দেহজনক নাগরিকদের ১০০ দিনের কাজ দেওয়া বন্ধ করার প্রস্তাব দেন।

রন্তিদেব সেনগুপ্ত বলেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পর এমন কোনো নেতা আসেননি যিনি সমগ্র হিন্দু সমাজকে নেতৃত্ব দিতে পারেন। অথচ এই মুহূর্তে হিন্দুদের হাতে আরও রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োজন। অতীত ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে হিন্দুদের প্রবাদপ্রতিম উদাসীনতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নামে নিষ্ক্রিয়তা আজ হিন্দুদের খাদের কিনারে এনে ফেলেছে। বহরমপুরের একটি আবাসনে তিনটি মুসলমান পরিবারের আপত্তিতে পাঁচটি হিন্দু পরিবারের শাঁখ বাজানো বন্ধ হয়ে গেলেও কোনো হিন্দু এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করেন না। নলহাটিতে মুসলমানদের চোখ রাঙানিতে দুর্গাপুজো বন্ধ হয়ে গেলেও কাগজে এক লাইন খবর হয় না। রন্তিদেববাবু সখেদে প্রশ্ন করেন হিন্দুদের মেরুদণ্ড যদি এত পলকা হয় তা হলে কে তাদের বাঁচাবে? হিন্দু ঐক্যের ওপর তিনিও জোর দেন। না হলে হিন্দু তো বটেই ভারতও বাঁচবে না।

ড. সুরেন্দ্র জৈন তার মনোগ্রাহী ভাষণে প্রতিটি শ্রোতার হৃদয় স্পর্শ করেন। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তিনি বলেন, 'আমরা, হিন্দুরা চিরকাল সাপের মধ্যে ব্রহ্মকে দেখেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সাপ তা দেখেনি। তাই আজ আমাদের চারিদিকে শত্রু।' তিনি আরও বলেন এটা মার খেয়ে পালানোর সময় নয়। ঘুরে দাঁড়ানোর সময়। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত সেই চেষ্টা শুরু করেছে। অনুষ্ঠানের শেষে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণবঙ্গ সম্পাদক উপস্থিত বিশিষ্টজন-সহ শ্রোতৃমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সংবাদ প্রতিবেদন

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবিভিপি-র নিরঙ্কুশ জয়লাভ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ আরও একবার দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করল। চারটি আসনের তিনটি দখল করেছে তারা। অন্যটি গেছে এন এস ইউ আই-র দখলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি) হলো ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শে উদ্বুদ্ধ সর্বভারতীয় এক ছাত্র সংগঠন। অন্যদিকে এন এস ইউ আই কংগ্রেসের।

এবিভিপি-র নবনির্বাচিত সভাপতি অমিত তানওয়ার, সহ-সভানেত্রী প্রিয়াঙ্কা ছাবরি এবং সাধারণ সম্পাদক অঙ্কিত সিং।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক ডি. এস. রাওয়াত জানিয়েছেন, নব নির্বাচিত ছাত্রসংসদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন এবিভিপি-র অমিত তানওয়ার। প্রিয়াঙ্কা ছাবরি এবং অঙ্কিত সিং যথাক্রমে সহসভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। এন এস ইউ আই-এর মোহিত গারিদ যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। জয়লাভের খবরে উচ্ছ্বসিত অমিত তানওয়ার বলেন, 'আমরা সারাবছর ছাত্রছাত্রীদের পাশে ছিলাম। তাই নির্বাচনে জিতেছি। আমাদের ভোটও আগের থেকে বেড়েছে।' এবারের নির্বাচনে প্রিয়াঙ্কা ছাবরি ছিলেন একমাত্র মহিলা প্রার্থী। তিনি পেয়েছেন ১৫,৫৯২টি ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়েছেন ২৪৫৫ ভোটের ব্যবধানে। অমিত তানওয়ার পেয়েছেন ১৬৩৫৭টি ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এন এস আই ইউ-এর নিখিল যাদবকে হারিয়েছেন ৪৬৮০ ভোটের ব্যবধানে। সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত অঙ্কিত সিং পেয়েছেন ১৫,৫১৮টি ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়েছেন ১৩৮৩ ভোটের ব্যবধানে।

এবারের নির্বাচনে মোট ১,২৩,২৪৬ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নেন। ৫১টি কলেজের ১১৭টি বুথে ভোটগ্রহণ করা হয়। ১৭,৭১২ জন ভোটার নোটা প্রয়োগ করেন। আম আদমি পার্টির ছাত্র সংগঠন ছাত্রযুব সংঘর্ষ সমিতি এবারের ভোটে অনুপস্থিত ছিল। অন্যদিকে বামপন্থী ছাত্রসংগঠন এ আই এস এ উল্লেখযোগ্য কোনো ছাপ রাখতে পারেনি।

বিশ্বজুড়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বালুচদের প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। বালুচিস্তানে পাকিস্তানি সৈন্যের নির্মম অত্যাচার এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বজুড়ে বালুচ নেতারা প্রতিবাদের ঝড় তুলেছেন। সেই সঙ্গে তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তাঁরা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। সম্প্রতি দক্ষিণ কোরিয়ার বন্দর শহর বুসানে বালুচ নেতারা একত্রিত হয়ে বালুচিস্তানে পাকিস্তানি সৈন্যের বর্বরতা অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি জানান। সেইসঙ্গে দেওয়া হয় স্বাধীন বালুচিস্তানের শ্লোগান। বালুচ রিপাবলিকান পার্টির মঞ্চ থেকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, করাচিতে মিলিত হয়ে বালুচ মানবাধিকার সংগঠনের নেতারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাঁদের অভিযোগ বালুচিস্তানের টারব্যাট শহরে রউফ বালুচকে গৃহবন্দি করে পাকিস্তানি সেনা তাঁর ওপর অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে। তাঁরাও বালুচিস্তান প্রসঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা করেন। প্রতিবাদের সুর শোনা গেছে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নেও। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের আন্দোলন তাঁরা ক্রমশ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চান বলে দাবি করেছেন বালুচ নেতারা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সম্প্রতি সর্বদলীয় বৈঠক এবং স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মোদী উল্লেখ করার পরই বালুচিস্তান, গিলগিট- বালটিস্তান এবং পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে দীর্ঘদিন ধরে পাক সেনার বর্বরতার বিষয়টি আন্তর্জাতিক মান্যতা পায়। উল্লিখিত জায়গাগুলির অবস্থা যে শোচনীয় মোদী স্পষ্টরূপে তাঁর ভাষণে বলেছিলেন। আরও জানিয়েছিলেন দীর্ঘদিন ধরে সেখানকার মানুষ এর বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। প্রতিক্রিয়ায় বালুচ নেতারা ভারতের সাহায্য প্রার্থনা করে। লাগাতার প্রতিবাদ আন্দোলন এবং আন্তর্জাতিক দুনিয়ার ক্রমবর্ধমান চাপের সামনে পাকিস্তান কী সিদ্ধান্ত নেয় এখন শুধু সেটাই দেখার।

সংস্কৃতকে রাষ্ট্রপুঞ্জের স্বীকৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মানবসভ্যতার প্রাচীনতম ভাষা হিসেবে সংস্কৃতকে স্বীকৃতি দিল রাষ্ট্রপুঞ্জ। সম্প্রতি রাষ্ট্রপুঞ্জের জাতিসনদ সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। তাতেই মিলেছে স্বীকৃতি। সমগ্র অনুবাদ কর্ম পরিচালনার দায়িত্ব ছিল ভারতের জাতীয় পাণ্ডুলিপি মিশনের কাঁধে। মিশনের অনুবাদক ড. জিতেন্দ্র কুমার ত্রিপাঠী অনুবাদ করেন। রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি বলেন, 'আমি ড. ত্রিপাঠীকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। এমন একটি কাজের যোগ্য স্বীকৃতিই পাওয়া গেছে।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৪৫ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জ পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিস্বরূপ এই জাতিসনদটি প্রকাশ করেছিল। ওই বছরের ২৬ জুন সান ফ্রানসিসকোর ওয়ার মেমোরিয়াল অ্যান্ড পারফরমিং আর্ট সেন্টারে জাতিসনদ স্বাক্ষরিত হয়।

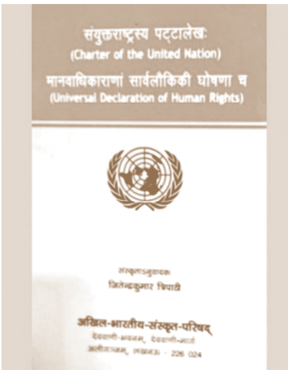

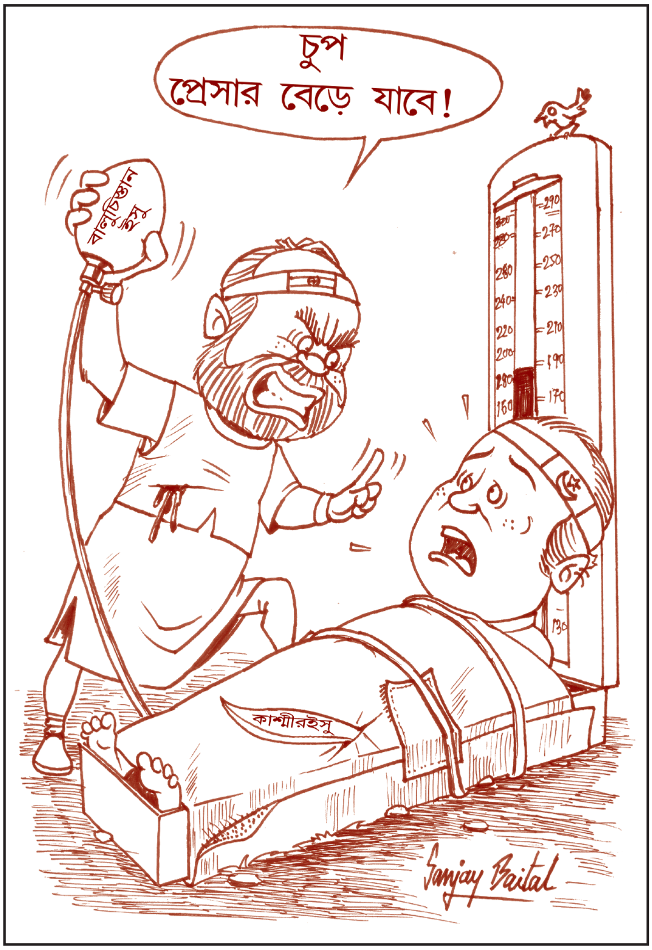

উবাচ

"কলেজিয়ামের সদস্য কোনো বিচারক যদি মনে করেন উচ্চতর আদালতের জন্য বিচারক নির্বাচন প্রক্রিয়া পুরোপুরি স্বচ্ছ নয়, তাহলে আমার পরামর্শ, তিনি পদত্যাগ করুন। তারপর পদত্যাগের প্রকৃত কারণটি জনসমক্ষে নিয়ে আসুন। তাতে সাধারণ মানুষ তাকে ভালোভাবে বুঝতে পারবে।"

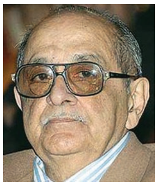

ফলি নরিম্যান
সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি

কলেজিয়ামের কাজকর্মে স্বচ্ছতার অভিযোগ প্রসঙ্গে।

"আমরা জানতাম রাজীব গান্ধী ফাউন্ডেশনকে কিংবা এর সঙ্গে যুক্ত সংস্থাকে জাকির নায়েকের এনজিও থেকে অনুদান দেওয়া হয়ে থাকে। এ নিয়ে আমরা রাজনীতি করতে চাইনি।"

কিরেন রিজিজু
ভারতের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

জাকিরের সঙ্গে কংগ্রেসের সংযোগ প্রসঙ্গে।

"পাকিস্তান যদি আফগানিস্তানের ব্যবসায়ীদের ওয়াঘা বর্ডার ব্যবহারের অনুমতি না দেয়, তাহলে আফগানিস্তানও মধ্য এশিয়া ও অন্যান্য দেশে রপ্তানির জন্য পাকিস্তানকে আফগানের পথ ব্যবহার করতে দেবে না।"

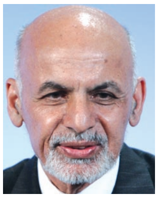

আশরাফ গনি
প্রেসিডেন্ট, আফগানিস্তান

"বাংলাদেশে গোরু ও উট— দুইই পাচার করতে বাংলাদেশ সীমান্তকে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এই বাণিজ্যের টাকা সন্ত্রাসবাদীদের ফান্ডে যাচ্ছে।"

কলকাতায় এন ইউ জে-এর অনুষ্ঠানে।

মানেকা গান্ধী
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তর

"জাতীয় স্বার্থের দিকে তাকিয়ে প্রত্যেক প্রজন্মেরই শিক্ষানীতির পুনর্বিচারের অধিকার আছে।"

এক সাক্ষাৎকারে।

প্রকাশ জাভড়েকর
কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী

পাকিস্তানকে শিখণ্ডী করে ভারতকে বিপাকে ফেলতে চাইছে চীন

ভারতের প্রধান শত্রু কে? অনেকেই বলবেন পাকিস্তান। আমার তা মনে হয় না। আমাদের প্রধান শত্রুরাষ্ট্র চীন। চীনা খুঁটির জোরেই পাকিস্তান ভারত-বিরোধিতায় নেমেছে। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত ও চীন এই দুই মহাশক্তিধর রাষ্ট্র এখন পরস্পরের মুখোমুখি। ভারতের প্রায় সমস্ত প্রধান জনবহুল শহরকে লক্ষ্য করে উত্তর ও উত্তরপূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে চীন পারমাণবিক গাইডেড মিশাইল বসিয়েছে। এইসব মিশাইল পাঁচ হাজার থেকে দশ হাজার কিলোমিটার দূরত্বের লক্ষ্য বস্তুর উপর আক্রমণ চালাতে পারে। এতকাল এর জবাব দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। সম্প্রতি আমরা দেশজ প্রযুক্তিতে তৈরি 'ব্রহ্ম' ব্যালিস্টিক মিসাইল উত্তর-পূর্বের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বসাতে পেরেছি। ভারতের এই পারমাণবিক মিশাইল চীনের যে কোনো এলাকার লক্ষ্যবস্তুর উপর আঘাত হানতে পারে। ১৯৬২ সালে অপ্রস্তুত ভারত চীনা আক্রমণের মোকাবিলা করতে পারেনি। আমাদের হারাতে হয়েছে অরুণাচল প্রদেশের একটা বড় এলাকা। চীন দখল করেছে লাদাখের কাছে আকসাই চীন। ২০১৬ সালে ভারত চীনা আক্রমণ প্রতিরোধে প্রস্তুত। তাই চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ১৯৬২-তে যে কাজ সহজেই করতে পেরেছিলেন, ২০১৬ সালে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী জি জিংপিং তা করতে পারবেন না। চীনা শাসকরা পাকিস্তানকে শিখণ্ডী খাড়া করে ভারতকে জব্দ করার নীতি নিয়েছে।

চীনের লক্ষ্য, আরব রাষ্ট্রজোট-সহ আফ্রিকায় তার বহির্বাণিজ্যর বিস্তার। এর জন্য চাই আরব সাগরের তীরে একটি নিরাপদ সমুদ্র বন্দর। পাকিস্তান চীনকে সাগ্রহে সেই সুযোগ দিয়েছে। চীনের সিংকিয়াং প্রদেশের কাশগড় থেকে গিলগিট— বাল্টিস্তান ছুঁয়ে বালুচিস্তানের

গূঢ় পুরুষের কলম

গোয়াদর সমুদ্র বন্দর পর্যন্ত সড়ক ও রেলপথ নির্মাণের কাজ চলছে। এই প্রকল্পের জন্য চীন ৪৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করছে। প্রকল্পের কাজ শেষ হলে চীন সহজেই তার রপ্তানি বাণিজ্য-বিস্তার করতে পারবে। পাকিস্তানের লাভ, তারা চীনা অস্ত্রশস্ত্র সহ সবরকম সামরিক সাহায্য দ্রুত পাবে। কাশ্মীর দখলের স্বপ্ন সফল হবে। পাক-চীন অশুভ আঁতাত যে ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক তা বুঝতে অসুবিধা নেই। সম্প্রতি চীন থেকে প্রকাশিত মানচিত্রে চীনা অধিকৃত আকসাই চীনকে চীনের মূল ভূখণ্ডের অংশ বলে দেখানো হয়েছে।

তাছাড়া পাক অধিকৃত কাশ্মীরকেও পাকিস্তানের মূল ভূখণ্ড বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কাশ্মীরের ভারতীয় এলাকাকে বিতর্কিত বলে চিহ্নিত করা আছে। ভারতভুক্ত কাশ্মীরকে চীন পাকিস্তানের অংশ বলেই মনে করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর চীন সফরকালে তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে পাকিস্তান এবং কাশ্মীর নিয়ে কোনো দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হবে না।

প্রয়োজনে পাকিস্তানকে চীন সামরিক সাহায্য দেবে তার প্রমাণ পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে চীনা সেনার উপস্থিতি। এখানে চীনা সেনার নাম পরিবর্তন করে বলা হয় পিপলস্ লিবারেশন আর্মি। সংক্ষেপে, পি এল এ। গত এক বছরে চীনা সেনা ২৭০ বার ভারত সীমান্ত লঙ্ঘন করেছে। কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে এখন পাকিস্তান যে যুদ্ধের ফিকির খুঁজছে তাতে মদত দিচ্ছে চীন। ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রধান ফলি হোমি মেজর অতীতে বহুবার সতর্ক করে বলেছেন, পাকিস্তানের থেকেও চীনের কাছ থেকে বিপদ অনেক বেশি। সামরিক শক্তির বিচারে পাকিস্তান ভারতের থেকে অনেকটাই হীনবল। কিন্তু ভারতের তুলনায় চীন সামরিক শক্তিতে বেশি শক্তিধর। এর কারণ, প্রতিরক্ষা খাতে ভারত বছরে প্রায় আড়াই লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করে। আন্তর্জাতিক মূল্যমানে ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সেখানে চীন তার প্রতিরক্ষার খাতে খরচ করে ১৪৫ বিলিয়ন ডলার।

কোনো সন্দেহ নেই যে চীন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র। কমিউনিস্ট বুলির আড়ালে চীন অন্য রাষ্ট্রের জমি দখল করতে চায়। তিব্বতকে লামাদের ধর্মীয় শাসন থেকে মুক্ত করার নামে আজ সেখানে চীনাদের অবাধ অনুপ্রবেশ করানো হয়েছে। তিব্বতের ব্যবসা-বাণিজ্য সবই এখন চীনাদের দখলে। তিব্বতিরা নিজ ভূমিতে পরদেশি। চীনের বিপুল জনসংখ্যাকে মূল ভূখণ্ড থেকে গিলগিট-বাল্টিস্তান-সহ কারাকোরাম অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়াটাই এখন লক্ষ্য।

মদনদাদা, মদনদাদা, তোমায় দেখতে যাব...

প্রিয় মদন মিত্র,

আপনাকে যে কোন ঠিকানায় চিঠি পাঠাই! যখন লিখছি তখন আছেন হোটেলে। যখন চিঠি পৌঁছবে তখন কোথায় থাকবেন কে জানে! বাড়ি, জেল, হাসপাতাল কোথায় যে থাকবেন কে জানে! মামলা যে মেটেনি। সহজে মেটারও নয়। কতদিন আপনি অভাবশালী সেজে থাকতে পারবেন কে জানে!

জানি, দলের সবাই যখন একই অপরাধ করেও বহাল তবিয়তে ঘুরছে, ফিরছে, মস্তি করছে তখন আপনার বন্দিদশা নিয়ে আপনি যথেষ্ট হতাশ। হতাশার কোনো দোষ নেই, এটাই স্বাভাবিক। আপনি যে প্রভাবশালী সেটা জানতে কারও বাকি নেই। আর তাই অভাবশালী সেজে থাকাটা মোটেও সহজ কাজ নয়। মন্ত্রী নন, বিধায়ক নন— তার মানেই আপনার প্রভাব কমে গেল! এটা কি মানা যায়?

আমার মনে আছে ভোটে হারের পরে আপনি বেশ হতাশ হয়ে গিয়েছিলেন। সারদা মামলার শুনানিতে আলিপুর আদালতে হাজিরা দিতে এসে বলেছিলেন, 'ছোট থেকে ধারণা ছিল যাঁরা সামনের সারিতে বসেন তাঁদের জীবন ধন্য হয়। জামিন পেলে প্রথমের সারিতে আর কোনোদিন বসব না। পিছনের সারিতে একদম কোণে বসব। কারণ, ছুরিটা পিছনের দিক থেকে আসে তো!' প্রশ্ন ছিল, অভিমান থেকে বলেছেন? জবাব দিয়েছিলেন, 'নাহ্, কোনো অভিমান নয়। থাকলাম তো অনেক দিন। এত সানলাইট আমার সহ্য হচ্ছে না।'

রাজ্যে বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগেই জেল থেকেই দলের টিকিটে ভোট লড়তে চেয়েছিলেন আপনি। আলিপুর আদালতে এসেই একদিন সাংবাদিকদের বলেছিলেন, আপনি এখনও দলের বিধায়ক। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে দলের প্রার্থী ঠিক করার সময়ে 'সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত' নেবেন, তাতে সন্দেহ নেই। আপনি যে নেত্রীকেই বার্তা দিতে চেয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। নেত্রীও আপনাকে প্রার্থী করেন। নিজে প্রচারে না থাকতে পারলেও পরিবারের সকলে কামারহাটিতে প্রচারে নামেন। তবুও জয় মেলেনি। কিন্তু কেন? তৃণমূলের এত বিপুল জয়ের মধ্যেও আপনি হেরে গেলেন? আপনাকে অভাবশালী প্রমাণ করতেই কি দল করুণা করে হারিয়ে দেয় আপনাকে!

২০১১ সালে রাজ্যে পালাবদলের পরে মন্ত্রীসভায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের পাশাপাশি আপনাকে দলের একাধিক দায়িত্ব দিয়েছিলেন নেত্রী। মন্ত্রী থাকা অবস্থাতেই সারদা কাণ্ডের জেরে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পরেও নেত্রী প্রথমদিকে মন্ত্রিত্ব কাড়েননি। মাঝে আপনি জামিনে কয়েকদিনের জন্য বাড়ি ফিরলেও শেষপর্যন্ত জেলেই ফিরতে হয়। 'প্রভাবশালী' নেতার বন্দি-জীবনের বেশিরভাগ সময় অবশ্য কাটছে হাসপাতালের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে। তখনও প্রভাব ছিল, এখন অবশ্য আপনি অভাবশালী। কিন্তু জেলবন্দি হওয়ার পরে ক্রমশই দলের কাজ থেকে যে আপনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন সেটা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন।

দল তেমন যোগাযোগ রাখেন কিন্তু প্রার্থী করে কি আসলে 'সুযোগ' দিয়েছিলেন নেত্রী। নাকি চিরতরে অভাবশালী বানিয়ে দেওয়ার খেলা ছিল সেটা! আপনি না বুঝেই অবশ্য প্রত্যাশার আলো দেখেছিলেন। কিন্তু হেরে গিয়ে সেই আলোও যেন ফের মিলিয়ে যায়। বর্ণময় রাজনৈতিক জীবন থেকে হঠাৎই দমবন্ধ করা এক পরিস্থিতি।

কিন্তু সেই আঁধারই কি আলো এনে দিল? বরাবর 'প্রভাবশালী' তত্ত্বেই আপনার জামিন আটকে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার আপনার আইনজীবীরা আদালতে বলেন, 'মদন মিত্র এখন আর প্রভাবশালী নন। মন্ত্রিত্ব হারিয়েছেন, ভোটেও পরাজিত হয়েছেন'। এর উত্তরে সিবিআইয়ের আইনজীবী পালটা যুক্তি দিয়ে বলেন, 'মদন মিত্র আমাদের জন্য হারেননি। হেরেছেন সারদার আমানতকারীদের অভিশাপে। জীবন্ত অবস্থায় কেউটে পিঁপড়ে খায়। কিন্তু মারা গেলে সেই কেউটেকেই আবার পিঁপড়েরা খায়। তবু কেউটে, কেউটেই। হাতি জীবিত হোক বা মৃত, দাম লাখ টাকা। মদন মিত্র মন্ত্রী আছেন কী নেই, গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁর প্রভাব এখনও রয়েছে। ছাড়া পেলে তিনি সাক্ষীদের ভয় দেখিয়ে প্রভাবিত করতেই পারেন।'

সত্যিই তো তাই আপনার মতো নেতা ভোটে হেরে গেলেই কি প্রভাবশালী থেকে অভাবশালী হয়ে যেতে পারেন!

মনে আছে, যে দিন কোপা আমেরিকা ফাইনালে হেরে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিয়েছিলেন লিওনেল মেসি, সেদিন আলিপুর আদালতে ফুটবল তারকার অবসরের সিদ্ধান্তের তুলনা টেনে আপনি বলেন, 'মেসির সঙ্গে আমার তফাত হচ্ছে, মেসি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ খেলা খেলে তারপর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমার খেলাটা এখনও বাকি আছে!'

লিওনেল মেসি ফিরেছেন। মদন মিত্রও কি রাজনীতিতে ফিরবেন?

আমি বলি কী ছেড়ে দিন। দিদিও তাই চাইছেন। আপনাকে আর খেলায় নেবেন না। তাই আপনি নতুন খেলা শুরু করুন। নাতির সঙ্গে লুকোচুরি।

—সুন্দর মৌলিক

ভারতীয়ত্ব, হিন্দুত্ব এবং রাষ্ট্রচিন্তা

সঞ্জয় সোম

এই বিষয়ে আলোচনার শুরুতেই, একটি ভুল ধারণা যা ইংরেজি শিক্ষার ফলস্বরূপ আমাদের অধিকাংশের মনে গেঁথে দেওয়া হয়েছে, সেটিকে ভেঙে দেওয়া প্রয়োজন। আমাদের এই স্বর্গাদপি গরীয়সী পুণ্যভূমি মাতৃভূমি নাকি ইংরেজের দান, তার আগে নাকি ভারতবর্ষ বলে কোনো একীভূত রাষ্ট্রের অস্তিত্বই ছিল না, বিদেশিরাই আমাদের দেশকে একসূত্রে গেঁথে আধুনিক ভারতের রূপ দিয়েছে। আসলে, আমাদের ইতিহাস, আমাদের সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, আমাদের পূর্ব বৈভব এবং কীর্তিগাথা, আমাদের বহুমাত্রিক সমাজব্যবস্থা, আমাদের ধর্ম ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং আমাদের অতীত গৌরব ও মনন যদি সুপরিকল্পিত ভাবে বিনাশ করে, তাকে ভুলিয়ে দিয়ে, বিজাতীয় চিন্তাধারা এবং হীনমন্যতার আধিপত্য কায়েম না করা যায়, তাহলে আমরা দাস হিসেবে তাদের বশ্যতা স্বীকার করবো কেন? এই ধারা বিগত ১০০০ বছর ধরে এ দেশে নির্বিবাদে চলেছে এবং স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ইংরেজ দ্বারা শিক্ষিত এবং মানসিক ভাবে ব্রাউন সাহেবরাও সেই ধারাকেই অনুসরণ করে এসেছেন। রাষ্ট্রের হাজার হাজার বছর ধরে প্রতিষ্ঠিত গুণাবলীকে সামনে রেখে, অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মধ্যে এক যোগসূত্র স্থাপন করে, সমৃদ্ধ এবং সম্পৃক্ত ভারত গড়ার বিন্দুমাত্র চেষ্টা হয়নি।

মনে রাখতে হবে, আজ থেকে ২০০০ বছর পূর্বে খ্রিস্টের আগমন আর ১৪০০ বছর পূর্বে মহম্মদের। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় এখন এটি প্রমাণিত যে সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতা আনুমানিক ৮০০০ বছরের পুরনো এবং বৈদিক সভ্যতার ঐতিহাসিক কালখণ্ড সম্ভবত ১০ থেকে ১৬ হাজার বছর পূর্বের, যে সময়ে খ্রিস্টধর্ম এবং ইসলামের জন্মই হয়নি, ভারতে অবস্থান বা ভারত গঠন তো দূরের কথা। আমাদের সুপ্রাচীন বিষ্ণুপুরাণ ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান এবং ভারতীয়দের

স্বামী বিবেকানন্দ

বীর সাভারকর

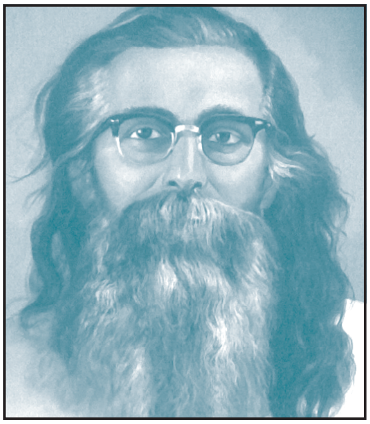

শ্রীগুরুজী

সম্পর্কে বলছেন—

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।

বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ। (২/৩/১) —অর্থাৎ যে ভূমি সমুদ্রের উত্তরদিকে এবং হিমালয়ের দক্ষিণদিকে অবস্থিত, সেই দেশের নাম ভারত এবং সেখানে ভরতের বংশধরগণ বাস করেন।

আবার সুপ্রাচীন বৃহস্পতি অগম, যা শ্রুতি শ্রেণীয়, ভারতবর্ষ সম্পর্কে কী বলছেন?

হিমালয়ং সমারভ্য যাবদিন্দু সরোবরম্।

তং দেব নির্মিতং দেশং হিন্দুস্থানং প্রচক্ষ্যতে।। —অর্থাৎ হিমালয় থেকে আরম্ভ হয়ে ইন্দু সরোবর (মহাসাগর) অবধি এই দেবনির্মিত দেশ হিন্দুস্থান নামে পরিচিত।

ভারতবর্ষ অর্থাৎ হিন্দুস্থান যে সুপ্রাচীন তার আরও প্রমাণ মেলে বৈদিক স্নানমন্ত্রে, যেখানে ঋষি বলেছেন—

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।

নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলহস্মিন সন্নিধিন কুরু।। —অর্থাৎ গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু, কাবেরী এই নদীগুলির কাছে প্রার্থনা করছি তোমরা এই জলে সম্মিলিত হও। এই পুণ্যসলিলা নদীগুলির আজকের অবস্থান দেখলেই বোঝা যাবে সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের সবকটি প্রধান নদীরই উল্লেখ এই বেদমন্ত্রের মধ্যে সমাবিষ্ট। তাহলে, এ ব্যাপারে কোনো অস্পষ্টতা নেই যে ভারতবর্ষ কোনো বিদেশিদের দ্বারা একসূত্রে গাঁথা কয়েকশো বছরের কৃত্রিম রাষ্ট্র নয়, ভারত এক সুপ্রাচীন পুণ্যভূমি যার সন্তানেরা হিন্দু নামে পরিচিত। কারণ হিমালয়ের 'হি' আর ইন্দু সরোবরের 'ইন্দু' থেকে নেওয়া এই শব্দে আমাদের মাতৃভূমির সম্পূর্ণ বিস্তারের বর্ণনা এসে যায়। অর্থাৎ ভারতবাসী এবং হিন্দু এক এবং সমার্থক। আর এস এস-এর দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রী গোলওয়ালকার (গুরুজী) এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'হিন্দু শব্দই প্রকৃত অর্থে আমাদের রাষ্ট্রীয় ভাবকে সম্পূর্ণ এবং স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করে।'

কিন্তু ভারতীয়ত্ব এবং হিন্দুত্ব শুধুমাত্র একটি ভৌগোলিক অবস্থানের পরিচায়ক

নাকি এই শব্দ দুটি কোনো বৃহত্তর জাতীয় চরিত্রের নির্দেশক, সেই সম্পর্কে একটু আলোচনা করি। প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, হিন্দু শব্দের স্থানে ভারতীয় কেন নয়? ঠিক এই প্রশ্নটিই যখন শ্রী গুরুজীকে করা হয়, তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'নিঃসন্দেহে প্রাচীনকাল থেকে 'ভারতীয়' শব্দও আমাদের সঙ্গে একীভূত হয়ে রয়েছে এবং ওই শব্দ আমাদের দেশ ও জাতির নামে পরিচিত। কিন্তু ওই শব্দ প্রসঙ্গে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণত একে 'ইন্ডিয়ান' শব্দের অনুবাদরূপে ব্যবহার করা হচ্ছে...।' অর্থাৎ আমাদের বুঝে নেওয়া প্রয়োজন যে ইংরেজ দ্বারা নামাঙ্কিত, ইংরেজি ভাবধারায় প্রেরিত এবং ইংরেজ দ্বারা ত্রিখণ্ডিত 'ইন্ডিয়া' আমাদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য, সমাজব্যবস্থা এবং সংস্কৃতির যথার্থ ধারক এবং বাহক নয়। এখানে শ্রী গুরুজীর এই আপত্তির প্রেক্ষিত নিয়ে কিঞ্চিৎ চর্চা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এবং তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধে হবে ভারতীয়ত্ব মূলত কী এবং ইন্ডিয়ানত্বের সঙ্গে পার্থক্যটি কী এবং কোথায়।

স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, 'সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক রূপান্তর— ইহাই ভারতীয় জীবন-সাধনার মূলমন্ত্র, ভারতের চিরন্তন সঙ্গীতের মূল সুর, ভারতীয় সত্তার মেরুদণ্ডস্বরূপ, ভারতীয়তার ভিত্তি, ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান প্রেরণা ও বাণী (৫/৩৯৬)। এ জাতির লক্ষ্য ও প্রাণশক্তি হলো ধর্ম। এই ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ হয় নাই বলেই জাতি এখনো বেঁচে আছে।' এখন যদি আমরা রিলিজিয়ন অর্থে ধর্মকে দেখি সেটি মহা ভুল হবে কারণ ভারতীয় ধর্ম শব্দটির কোনো বিদেশি প্রতিশব্দ নেই। ঠিক যেমন সাধনা শব্দটিরও কোনো বিদেশি প্রতিশব্দ নেই। ন্যায় এবং নীতির নির্ণায়ক মাপদণ্ড কি? ধর্ম। ধৃয়তে ধর্ম ইত্যাহুঃ স এব পরম প্রভুঃ। এ সেই ধর্ম (ধৃ+মন্) যা সমগ্র সমাজকে ধারণ করে। এবং তার থেকে উদ্ভূত হয় ধর্মজ্ঞান যা মানুষকে পশু পাখি কীট পতঙ্গ থেকে আলাদা করে, ন্যায় অন্যায়, ভালো মন্দের মধ্যে ভেদাভেদ করতে শেখায়। ধর্মের ব্যাখ্যা হলো--- 'যতো অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম' অর্থাৎ ধর্ম সকলের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও মোক্ষলাভের পথ। ভারতের মূল ভিত্তি হলো এই ধর্ম এবং স্বভাবতই ভারতীয়ত্ব হলো ধর্ম অনুসারী জীবনযাপনের মূলভূত মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি। প্রথমেই যে সূত্রের অবতারণা করেছিলাম, সেই বিদেশি শিক্ষাপ্রণালীর দ্বারা প্রভাবিত, পন্থকে ধর্মের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলা, কাম ও অর্থের বশবর্তী, বিজাতীয় চিন্তাধারায় সিঞ্চিত, বিদেশি বেশভূষায় ভূষিত, বিদেশের সব ভাল আর আমাদের সব খারাপ, এই মনোভাবগ্রস্ত 'ইন্ডিয়াননেস' ও ভারতীয়ত্বের কি এক অর্থ হতে পারে?

এইবার আসি হিন্দুত্বের কথায়। হিন্দু কে তা আমরা আগেই দেখেছি। বীর সাভারকার তাঁর 'হিন্দুত্ব' নামক বইটিতে বলছেন, 'হিন্দুত্ব কোনো শব্দ বিশেষ নয়, এটি একটি ইতিহাস। শুধুমাত্র আমাদের আধ্যাত্মিক বা পন্থিক ইতিহাস নয়, যা ভুলবশত প্রায়শই মনে করা হয়, কিন্তু একটি সম্পূর্ণ ইতিহাস। আমরা যখন হিন্দুত্বের মূলভূত প্রাসঙ্গিকতা খুঁজতে যাই তখন আমরা কোনো বিশেষ দিব্যতান্ত্রিক বা বিশেষ পন্থিক মতবাদ ও বিশ্বাস নিয়ে ভাবিত হই না। হিন্দুত্ব আমাদের সমগ্র জাতির সমস্ত ক্ষেত্রের চিন্তাধারা এবং কর্ম সমূহের সমষ্টি। হিন্দুত্ব যে-ক'টি সিদ্ধান্তের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে সেগুলি চিরন্তন, যেমন সহিষ্ণুতা, সম্মান, সমন্বয়, স্বাধিকার এবং সংবাদ। এতে ঈশ্বরহীনতার স্থান আছে বৈকি, কিন্তু স্থান নেই ধর্মহীনতার। বহুত্ববাদ ও সংস্কার হিন্দুত্বের প্রকৃতি। হিন্দুত্বে মানুষে মানুষে কোনো প্রভেদ নেই। caste নামক বিজাতীয় শব্দটির সংস্কৃতে কোনো প্রতিশব্দই নেই, মনুষ্যত্বই হিন্দুর একমাত্র ধ্যেয়। আমরা দেখতে পাই মহাভারতের শান্তিপর্বে জাতির বৈশিষ্ট্য বোঝাতে গিয়ে ভৃগু ভরদ্বাজকে বলছেন, 'ব্রাহ্মণেরা গৌরবর্ণ, ক্ষত্রিয়রা রক্তবর্ণ, বৈশ্যরা পীতবর্ণ আর শূদ্রেরা কৃষ্ণবর্ণ'। উত্তরে ভরদ্বাজ বলছেন, 'যদি বিভিন্ন বর্ণ বিভিন্ন জাতি নির্দেশ করে তবে বলতে হয় সব জাতিই মিশ্র জাতি' (১৮৮/৬)। তারপরেই বলছেন, 'আমরা সকলেই কাম, ক্রোধ, ভয়, দুঃখ, উৎকণ্ঠা, ক্ষুধা ও শ্রম এই সবেই প্রভাবিত হই, তাহলে জাতিতে জাতিতে আমাদের প্রভেদ কোথায়?' এই মহাভারতেই অন্যত্র আমরা দেখি সম্রাট যুধিষ্ঠির বলছেন, 'ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হলেই তাকে ব্রাহ্মণ বলা যাবে না, তেমনি পিতামাতা শূদ্র হলেই কাউকে শূদ্র বলা সঙ্গত নয়' (বনপর্ব, ১৮০)। আরও দেখি পিতৃ পরিচয়হীন জারজ সন্তান সত্যকামকে গৌতম মুনি শিষ্যত্বে বরণ করে নিচ্ছেন ব্রাহ্মণ হিসেবে, আবার শূদ্রাণীর পুত্র মহামতি বিদুরকে 'মূর্তিমান ধর্ম' বলা হচ্ছে, স্বয়ং সম্রাট ধৃতরাষ্ট্র যার নৈতিকতার তেজের কাছে নতজানু (আশ্রমপর্ব, ২৮, ২১)। বৈদিক সমাজের তিন পরমশ্রদ্ধেয় ঋষির কথাই যদি ধরি, মহর্ষি বশিষ্ঠ ছিলেন এক গণিকার গর্ভজাত, ব্যাসদেব এক ধীবরকন্যার আর ঋষি পরাশর ছিলেন চণ্ডালিনীর সন্তান। হিন্দুত্বের এই সর্বংসহারূপ প্রস্ফুটিত পদ্মের সুরভি বহন করে আনে প্রাচীন ভবিষ্যপুরাণের একটি অসাধারণ শ্লোক। যাতে ঋষি বলছেন, 'যেহেতু চতুর্বর্ণের সব মানুষই ঈশ্বরের সন্তান, তাই তারা এক বর্ণের। সমস্ত মানুষের জনক এক, আর একই জনকের সন্তানদের ভিন্ন জাত হতে পারে না' (ব্রাহ্মপর্ব, ৪১, ৪৫)।

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠবে, ১০০০ বছর পর স্বাধীন হওয়া ভারতে, এই হিন্দুভূমে, আমরা যে রাষ্ট্রচালনা করছি তা কি সিদ্ধান্তিক ভাবে মূল ভারতীয়ত্বের চিরন্তন চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত? হিন্দুরা চিরকাল জন্মভূমিকে দেশমাতৃকারূপে আরাধনা করে এসেছে, শুধুমাত্র একটি ভৌগোলিক সত্তা হিসেবে নয়। স্বামীজী বলছেন, 'যদি এমন কোনো দেশ থাকে, যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে, তবে নিশ্চয়ই বলিতে পারি, তাহা আমাদের মাতৃভূমি— এই ভারতবর্ষ' (৫/৩)। আর মাতৃত্বকে বর্ণনা করছেন অপূর্ব, স্বার্থশূন্য, সর্বংসহা, নিত্যক্ষমাশীলা জননী রূপে। বলছেন, ''মা সর্বদাই ক্ষমা করেন। মাতৃভাব আর মাতৃ-শব্দ হিন্দু মনে চিরদিন অনন্ত প্রেমের সহিত জড়িত। আমাদের এই মরজগতে মায়ের ভালবাসাই ঈশ্বর-প্রেমের নিকটতম'' (৫/৪৩২)। আমাদের এই স্বর্গাদপি গরিয়সী জননী জন্মভূমিকে আমরা কোন পথে নিয়ে যাবো, প্রাচীন ভারতের

সঙ্গে আধুনিক ভারতের সেই যোগসূত্র দিয়ে গিয়েছেন পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় তাঁর একাত্ম মানবদর্শনে। ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, পোশাকপরিচ্ছদ, সম্প্রদায়গত বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও দেশের সঙ্গে একাত্মতা বোধ এবং দেশের প্রতি ভক্তি আমাদের পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে রেখেছে। সংক্ষেপে এই দর্শনের একটা রূপরেখা বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। এর সমস্ত প্রসঙ্গটিই তাত্ত্বিক এবং এই প্রবন্ধের স্বল্পপরিসরে তা ব্যাখ্যা করা কঠিন। তাই আমি এই দর্শনের মূলসূত্রগুলি ছুঁয়ে যাবো মাত্র। পণ্ডিতজীর ভাষায়, 'সত্যি কথা বলতে গেলে, প্রত্যেক জাতিরই তাঁর নিজস্ব 'চিতি'র কথা ভাবা উচিত। এইটি বাদ দিয়ে স্বাধীনতার কোনো অর্থ হয় না। স্বাধীনতা লাভের তীব্র ইচ্ছার মধ্যে এই মনোবাসনাই থাকে যে স্বাধীনতা লাভের পর জাতিটি নিজের স্বভাব ও প্রকৃতি অনুসারে সুখী জীবন যাপন করবে। যে জাতি এমন পথ অনুসরণ করে, এমন চিন্তায় ভাবিত ও প্রাণিত হয়, যা তাঁর নিজস্ব স্বভাব, বৈশিষ্ট্য ও সত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, সেই জাতি সঙ্কটাপন্ন হবেই। আমাদের দেশ যে সঙ্কটে পড়েছে তাঁর কারণ এটাই।' এই ভাবধারা স্বামীজীর সেই বিশ্বাসের অনুসারী, যেখানে তিনি বলছেন, 'জাতীয় জীবন— যে জাতীয় জীবন একদিন সতেজ ছিল তাহাকে পুনরায় সতেজ করিতে গেলে ভারতীয় চিন্তারাশি দ্বারা পৃথিবী জয় করিতে হইবে' (৫/১৭২-৭৩)।

যদি ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে একটি কুণ্ডলিনী রচনা করা যায় এবং তা ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে যদি আরও বড় সমকেন্দ্রিক আকার ধারণ করে যেখানে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, জাতি, মানবসমাজ এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সব এক সূত্রে গাঁথা, তাহলে পশ্চিমের বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাধারা ছেড়ে আমরা হিন্দুত্বের মূলমন্ত্রে ফিরে যেতে পারবো। জীবনের একটি উপাদান আর একটি উপাদানের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং পরস্পর নির্ভরশীল। ব্যক্তি, পরিবার এবং জাতি কোনো পৃথক পৃথক সত্তা নয়, তারা সমগ্র মানবসমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর ব্যক্তি থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক অন্তর্নিহিত যোগসূত্র বা বন্ধনে একত্রে যুক্ত, কারণ আমাদের স্রষ্টা এক। উদাহরণ স্বরূপ, প্রত্যেক ব্যক্তি এক পরিবারের অংশ। সেই পরিবারের ধর্মচেতনা, শ্রদ্ধাস্থান, সংস্কৃতি ইত্যাদির দ্বারা সেই ব্যক্তি প্রভাবিত হন। তাঁর একটি দেশ আছে, সেই দেশের ইতিহাস আছে, পরম্পরা আছে, কিছু শত্রু-মিত্রও আছে। আবার সেই দেশ পৃথিবীব্যাপী যা ঘটছে তার প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। আবার বহির্বিশ্ব থেকে কোনো উল্কা যদি ধেয়ে আসে যা পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিতে পারে, তখন সেটি প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই প্রাণহারিণী রূপ ধারণ করতে পারে।

এ তো গেল বাহ্যিক একাত্মতার কথা। এর সঙ্গেই জুড়ে আছে আধ্যাত্মিক একাত্মতার সূত্র এবং মানবদর্শন। হিন্দু ধর্মে চার পুরুষার্থের কথা বলা হয়েছে যেখানে ধর্ম এবং মোক্ষ দুই দিক দিয়ে ঘিরে রয়েছে অর্থ এবং কামকে, মোক্ষলাভ যার ঈপ্সিত লক্ষ্য। এই চার পুরুষার্থ সমগ্র ও সর্বাঙ্গীণ ব্যক্তিজীবনের মাপদণ্ড। এখানে ধর্ম সর্বোপরি অর্থাৎ ব্যক্তিই বা সমাজই হোক অথবা দেশ, ধর্মের ছত্রছায়ায় বাকি সব পুরুষার্থ পালিত হলে, জীবন সহজ ও স্বাভাবিক গতিতে চলবে। তাই সমষ্টি ধর্ম প্রসঙ্গে ঋষি বলছেন, 'ধর্ম ধারয়তি প্রজা'। যেহেতু ব্যক্তির মতন সমাজেরও শরীর-মন-বুদ্ধি-আত্মা আছে, প্রলোভন ও বিচ্যুতিও আছে এবং তাই একমাত্র ধর্মের সঙ্গে একাত্ম হলেই এর বিহিত সম্ভব। ধর্মের মূল লক্ষণ দশটি— ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ। সমাজ তথা দেশ যদি ধর্মের সঙ্গে একাত্ম না হয়, এগুলি না মানে তাহলে সর্বাঙ্গীণ সামুহিক বিকাশ সম্ভব নয়। একাত্ম মানবদর্শনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রী দত্তপন্থ ঠেংড়িজী বলছেন, 'পরিবার থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ বিশ্ব পর্যন্ত মানুষের ধাপে ধাপে যে রূপ আমরা দেখি, বস্তুত তা তার আত্মচেতনার বিকাশের বাহ্য রূপ। ব্যক্তি চেতনা যত উন্নত হবে, তত তার সম্বন্ধ আরও উচ্চস্তরীয় হতে থাকবে। তার মানে এই নয় যে ক্রমাগত উচ্চস্তরের চেতনায় উন্নীত যখন হবে তখন নিচুস্তরের সঙ্গে তার সম্বন্ধ নষ্ট হবে। এ পৃথকাত্মায় বিশ্বাসী নয়। নতুন সম্পর্কে যুক্ত হয়ে পুরনো সম্পর্ক ত্যাগ করে না। এ সর্বসমাবেশক। পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে নিজেকে ভুলে যাবো না। সমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পরিবার এবং নিজেকে ভুলে যাবো না। অখণ্ডমণ্ডলাকারে পৃথকতা নেই— এটি সর্ব সমাবেশক রচনা। আমার মনোবৃত্তি যখন সমাজকে ভালবাসার স্তরে উন্নীত হয়, তখনও আমি পরিবার ও নিজেকে ভালবেসে যাবো। আমার মনোবিকাশ স্তর যদি মানবজাতি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যায়, তবুও আমার সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রীতি প্রেম থাকবে। আরও আগে এগিয়ে যদি বিশ্ব চরাচরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাই তাহলেও রাষ্ট্রের সঙ্গে একাত্ম তো থাকছিই। আমি এক স্তরে ব্যক্তির সঙ্গে, দ্বিতীয় স্তরে পরিবারের সঙ্গে, তৃতীয় স্তরে রাষ্ট্রের সঙ্গে, আরও এগিয়ে সম্পূর্ণ মানবজাতির সঙ্গে, আরও এগিয়ে চরাচর সৃষ্টির এবং শেষে পরমেষ্ঠি অর্থাৎ সকলের সঙ্গে একই সময়ে একত্রিত থাকতে পারি।'

যথার্থ ইতিহাস আমাদের অনেক কিছু শেখায়। সুপ্রাচীন এবং গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্যময় সভ্যতার আলোকে যদি আমাদের বর্তমানকে যাচাই করি তাহলে আমরা আধুনিক ভারতেও বহুত্ববাদী উদার প্রগতিশীল হিন্দুরাষ্ট্রের ভিত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারব। আমাদের ঐতিহাসিক সংস্কারশুদ্ধ হিন্দুভূমিই অথর্ববেদে বর্ণিত অখণ্ড ভারতমাতা, যে মাতৃভূমির বন্দনায় ঋষি বলছেন—

জনং বিভ্রতি বহুধা বিবাচসম, নানা ধর্মানং পৃথ্বী যথৌকসম।

সহস্রধারা দ্রবিনস্য মে দুহাম, ধ্রুবেন ধেনুর্নিপ্রস্ফুরন্তি।।

অর্থাৎ বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং বিভিন্ন গুণসমন্বিত একই পরিবারের মতো যিনি ধারণ করছেন, নিজ দুগ্ধধারাকে কোনো প্রকার প্রতিহত না করে, সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে রাখা গোমাতার ন্যায়, তিনি আমাদের ধন সম্পদের সহস্রধারা প্রদান করে চলেছেন, তিনিই আমাদের মাতৃভূমি।

এইখানেই ভারতীয়ত্ব, হিন্দুত্ব এবং রাষ্ট্রচিন্তা একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

■

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা নৈরাজ্যের দিগ্‌বলয়

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস

সংস্কৃতের অধ্যাপক মাননীয় রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে আমি চিনি না। শিক্ষক দিবসে তাঁর সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে সরকারি ছাত্র- সংগঠনের নেতা— সে খবরটা পড়ে মনে হলো রবীন্দ্রনাথবাবুর ব্যথিত মুখখানি আমাদের খুব চেনা। জীবনব্যাপী শিক্ষাদান করার পর শিক্ষকদের এমন পুরস্কারই তো দিয়ে চলেছে শাসক শ্রেণী। রাজ্যের যেখানে যত শিক্ষাক্ষেত্র সর্বত্রই গুণ্ডারাজ চলছে— চলছে তোলাবাজি, হেন অন্যায় অপরাধ নেই যা তারা করছে না। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে এমন নৈরাজ্য কোনোদিন দেখা যায়নি। এই পরিবর্তনই কী আমাদের রাজ্যবাসী চেয়েছিলেন ২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনে? এই পরিবর্তনকেই কি দু'হাত খুলে ভোট দিয়ে দ্বিতীয়বার অনুমোদন দিলেন তারা? ভাবতে ভাবতে স্তব্ধ হতবাক হয়ে যাই।

হতে পারে আমাদের রাজ্যবাসী দু'রকম মন্দের মধ্যে তুলনা করে উপরের সিদ্ধান্তে এসেছেন। বিগত বাম শাসনে শিক্ষাক্ষেত্রে স্ট্যালিনবাদী হুকুমদারি— চলতি ভাষায় যাকে আমরা 'অনিলায়ন' বলে জানি— সেকথা বাংলা আজও ভোলেনি। সেসময় শোনা যেত আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কার্যালয়ে অনিল বিশ্বাসের ঘরের সামনে টুলে বসে অপেক্ষা করতেন কৃপাভিক্ষু উপাচার্যেরা। কখন ডাক আসে সেই অপেক্ষায়। তখনকার সংস্কৃতিমন্ত্রী পরে জ্যোতি বসুর উত্তরাধিকারী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নাকি বলতেন, 'নন্দন'-চত্বরে পায়চারি করতে করতে উপাচার্য নিয়োগ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া হোত। অনিল বিশ্বাসের প্রবল নজরদারিতে বাংলার কোনো শিক্ষাক্ষেত্রে গাছের একটি পাতাও বিনা অনুমতিতে কাঁপতে সাহস দেখায়নি। গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন কমিশন। সেগুলিকে কবজা করে রাজ্যের শিক্ষক-অধ্যাপক-অধ্যক্ষ-উপাচার্য-আধিকারিক-অশিক্ষা কর্মচারী— সর্বত্র নিশ্ছিদ্র দখলদারি কায়েম করেছিল পার্টি। মুক্ত স্বচ্ছ সহজ বাতাসের অভাবে শিক্ষাক্ষেত্র হাঁসফাঁস করছিল। পরিবর্তন চাওয়ার প্রধান যুক্তিই ছিল সেখানে।

প্রথম দফায় তৃণমূল কংগ্রেসের শাসন শিক্ষাক্ষেত্রে বামপন্থীদের ব্যবহার করা জুতো পরেই দাপিয়ে বেড়িয়েছে। তারাও একইভাবে হুকুমদারি-দখলদারি চালাতে চেয়েছে। তবে বাম শাসনের কালে তৈরি হওয়া শিক্ষক-অধ্যাপকদের বাইরে মেরুদণ্ড সম্পন্ন আদর্শনিষ্ঠ সৎ বিবেচক বুদ্ধিজীবী বেশি ছিল না। নন্দীগ্রাম-পরবর্তী আন্দোলনে যারা যোগ দিয়েছিলেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন বয়সের ভারে ন্যুব্জ। যথারীতি অনিলায়নের জবাবে তৃণমূলীকরণের চেষ্টা করতে গিয়ে শাসকরা উপযুক্ত সংখ্যায় শূন্যস্থান পূরণ করতে ব্যর্থ হলেন।

প্রসঙ্গত একটি ব্যক্তিগত কথা লিখে রাখি। উক্ত পর্বে আমি মালদহের গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে কিছুদিন কাজ করেছি। ব্যক্তিগতভাবে আমি শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনৈতিক আধিপত্যের বিরোধী। ধারাবাহিকভাবে বহু হুমকি ও বঞ্চনা সহ্য করেছি কিন্তু প্রতিবাদ করতে ভুলিনি। পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন প্রসঙ্গে আমার বহু রচনা উপ-সম্পাদকীয় আকারে মুদ্রিত হয়েছে। আমাকে মনোনীত করার সময় শাসকদের মনে হয়তো এসব থেকেই ধারণা হয় আমি তাদের সমর্থন করব। শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপকে আমি অবাঞ্ছিত মনে করি— সেই অবস্থান শাসক বদলে গেলেই বদলে যেতে পারে না। ফল সহজেই অনুমেয়। স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় শাসকদলের এত্তেলা- ফরমান আসতে থাকল— আমি ক্রমাগত বোঝানোর চেষ্টা করলাম এসব মানতে পারব না। শেষ পর্যন্ত স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণ দেখিয়ে অব্যাহতি চাইলাম। তৃণমূলী শাসনে এ ছিল ব্যতিক্রমী ঘটনা। অন্তত এরকম আর কোনো ঘটনার কথা আমার

অনিলায়ন— অনিল বিশ্বাসের ঘরের সামনে অপেক্ষা করতেন উপাচার্যরা।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য--- নন্দন চত্বরে পায়চারি করতে করতে উপাচার্য নিয়োগ করতেন।

পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি শিক্ষক নিগ্রহের ঘটনা		
নাম	**স্থান**	**কারণ**
১। সন্তোষ ভট্টাচার্য, উপাচার্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৩-৮৭)	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	বেআইনি ভাবে নিযুক্ত কয়েকজন অশিক্ষক কর্মচারীকে বরখাস্ত করায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গন। এস এফ আই-এর কর্মীরা উপাচার্যের ঘরে ঢুকে তাঁকে হেনস্থা করে।
২। কিশোর কুমার রাই, অধ্যক্ষ দেবাশিস সরকার, অধ্যাপক	ঝাড়গ্রাম কলেজ মেদিনীপুর	তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দুই গোষ্ঠীর লড়াই থামাতে গিয়ে আক্রান্ত হন দু'জনে।
৩। সনাতন দাস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন পরীক্ষা নিয়ামক	দিওয়ান আবদুল গণি কলেজ দক্ষিণ দিনাজপুর	পরীক্ষার হলে গণটোকাটুকি বন্ধ করতে বলায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মীরা তাঁকে মারধর করে।
৪। মনোরঞ্জন নস্কর অধ্যক্ষ	কালীনগর মহাবিদ্যালয় উত্তর চব্বিশ পরগনা	এক্ষেত্রেও গণটোকাটুকি বন্ধ করতে বলায় আক্রান্ত হন। তবে এবার অভিযুক্ত এস এফ আই।
৫। স্বপ্না মুখোপাধ্যায় অধ্যক্ষ	মেঘনাথ সাহা কলেজ উত্তর দিনাজপুর	স্থানীয় তৃণমূল নেতা গৌতম পালের স্ত্রী পম্পা পালকে বই দেখে টুকতে না দেওয়ায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের গুণ্ডারা অধ্যক্ষার ওপর চড়াও হয়।
৬। আজিজুর রহমান প্রধান শিক্ষক	বিএসএস হাইস্কুল মানিকচক মালদহ	মানিকচক কলেজে স্থানাভাব। তাই ছাত্ররা সকালে ৬-১০ বিএসএস স্কুলে ক্লাস করত। কিন্তু স্কুল শুরুর সময় (১০.৩০) হয়ে গেলেও তারা ক্লাসরুমে গল্পগুজব করত। প্রধান শিক্ষক এর প্রতিবাদ করেছিলেন। যার ফল তাকে মাটিতে ফেলে মারধর।
৭। অমিত রায় অধ্যাপক	রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয় ঘাটাল, পূর্ব মেদিনীপুর	কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন পত্র পেশ করার দিনে টিএমসিপি ছাড়া অন্যান্য ছাত্র সংগঠনগুলিকে কলেজে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। অমিতবাবু তার প্রতিবাদ করে ফেসবুকে একটি পোস্ট করেছিলেন।
৮। দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় শিক্ষক	ফুলিয়া ইউনিয়ন অ্যাকাডেমি নদিয়া	কংগ্রেসের একটি প্রতিবাদ সভায় অংশ নিয়েছিলেন বলে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়।
৯। অমরজিৎ কুণ্ডু অধ্যাপক	শান্তিপুর কলেজ নদিয়া	মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। অভিযুক্ত টিএমসিপি। কারণ ছাত্র সংগঠনটির অগণতান্ত্রিক কাজকর্মের প্রতিবাদ।
১০। গোকুলানন্দ গোস্বামী অধ্যক্ষ	ফকিরচাঁদ কলেজ, ডায়মণ্ড হারবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা	গণটোকাটুকিতে বাধাদান।
১১। বিভাস সানিয়েল প্রধান শিক্ষক	স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুল কলকাতা	স্কুল ছুটির পর একদিন এক ছাত্র আকস্মিকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায়। মারমুখী অভিভাবকেরা চড়াও হন প্রধান শিক্ষকের ওপর।
১২। সুপর্ণা সাধু অধ্যাপক	কেশপুর কলেজ পশ্চিম মেদিনীপুর	অগণতান্ত্রিক কাজকর্মের প্রতিবাদ। অভিযুক্ত টিএমসিপি নেতা মানস ঘোষ।
১৩। অচিন্ত্য বিশ্বাস প্রাক্তন উপাচার্য	গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় মালদহ	রাজ্যের শাসক দল ও সরকারের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের প্রতিবাদ। শেষে স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ।

জানা নেই। অস্কার ওয়াইল্ড-এর কথা মনে পড়ে— মানুষ ভুল করে সে ভুলের নাম দেয় অভিজ্ঞতা। আমার এই অভিজ্ঞতাটুকু আজ পাঠকের সঙ্গে বিনিময় করে নিলাম।

পশ্চিমবঙ্গবাসী তৃণমূল-শাসনের পাঁচ বছরে ঘটা সব অনাচার, অব্যবস্থা নিশ্চয় খেয়াল করেছেন। তবু তাদের চোখে এই কুকীর্তি বিগত বাম শাসকদের কুকীর্তির তুলনায় কমই ঠেকেছে। দ্বিতীয় দফায় তৃণমূল কংগ্রেস আরও বিপুল সমর্থন নিয়ে ফিরে আসার পিছনে এমনি একটি যুক্তিই রয়েছে বলে মনে করি। শিক্ষাক্ষেত্রে শাসকদের অনাচার আজ লাগাম ছাড়া হয়েছে। সর্বত্র তাদের কথা— একমাত্র তারাই থাকবে— বাকিদের কোনো স্থান নেই। নৈরাজ্য-অপরাধ- অন্যায়ের সঙ্গে জুটেছে দুর্বৃত্তায়ন ও অর্থনৈতিক ভ্রষ্টাচার— টাকা নিয়ে ভর্তি করানো, উৎসবের নামে বে-লাগাম ফুর্তি, অধ্যাপকদের হেনস্থা থেকে শুরু করে এমন অন্যায় নেই যা তারা করছে না। খুন-জখম হয়েছে জলভাত। মহাবিদ্যালয়ে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা অকেজো করে ছাত্রসংসদের দপ্তরে হামলা চালিয়ে খুন করার মতো ঘটনা আমরা দেখেছি। দেখেছি ছাত্র নেতা গোপন ক্যামেরার সামনে বখরা চাইছে। কোথাও স্কুল-শিক্ষক দূর মফস্‌সল থেকে গাড়ি হাঁকিয়ে কলকাতায় এসে ছাত্র-নেতা বনে যাচ্ছে— এমনও দেখেছি। চক্ষু সার্থক হয়েছে বটে! শুনেছি ওই ছাত্রনেতা সেতু পারাপার করার সময় ভি. আই. পি. পথ ধরে বিনা কড়িতে আসছিল, প্রতিবাদ করায় উপস্থিত সরকারি কর্মীদের উপর হামলা চালাতে তার হাত কাঁপেনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যপূর্ণ সেনেট হলে অধ্যাপকদের সভা চলাকালীন ছাত্রদল যেভাবে হুল্লোড় চালিয়েছে তাতে সবরকম শোভনতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে! মহাবিদ্যালয়ে ঢুকে অধ্যাপককে পিস্তল দেখিয়ে ছাত্রনেতা ধমকাচ্ছে— তিনি যেন পরিচালক সমিতি নির্বাচনে না দাঁড়ান। স্কুলের মাস্টারমশাইকে রাত্রে বাড়িতে এসে গুলি চালিয়ে সবক শেখানোর ঘটনাও দেখা গেল।

আর একটি ঘটনা বিপদের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। শাসকদলের মধ্যেই একাধিক গোষ্ঠী গজিয়ে উঠেছে। তারা শুধু উপদলীয় কোন্দল করছে না— মুখোমুখি লড়ে যাচ্ছে। একটি কলেজে এক ছাত্রীকে দেখলাম বীরাঙ্গনার

অভিরূপ সরকার— 'শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই।'

সুগত মারজিৎ— 'সরকারের কাছের লোক'

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস— রাজ্যের শাসক দলের ও সরকারের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের প্রতিবাদ। শেষে স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ।

মতো ময়দানে নেমে অন্য দলের উপর হামলা করছে। এই ছাত্রীটি নাকি শ্রেণী-প্রতিনিধি। তার আর এক পরিচয় তফশিল ভুক্ত হওয়ার দাবিতে ভর্তি হবার সুবিধা পেয়েছে সে— কিন্তু তার কোনো শংসাপত্রই নেই। মোট কথা, হেন অন্যায় অপরাধ নেই যা এই ভৈরব বাহিনী করছে না।

অবস্থা বদলাতে পারত অধ্যাপক-বর্গ, শিক্ষককুল যদি প্রতিবাদ করতেন। তাঁদের প্রতিবাদের সাহস অবশিষ্ট থাকছে না। সরকার বিন্দুমাত্র সমর্থন করবে এমন আশা নেই। সরকার ছাত্র-সংসদগুলোতে মেলা-মোচ্ছবের জন্য ব্যাপক অনুদানের ব্যবস্থা করছে, কিন্তু বেতন বৃদ্ধির ন্যায্য দাবি মানার ব্যাপারে তাদের কোনো তাপ-উত্তাপ নেই। জুটেছেন কিছু বিচিত্র কর্মী বুদ্ধিজীবী। রাজ্য-বেতন-আয়োগের শীর্ষে বসে অধ্যাপক অভিরূপ সরকার ঘোষণা করছেন শিক্ষক-অধ্যাপকদের বেতন বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই। এর চেয়ে ক্লাবগুলোকে অনুদান দেওয়া ভালো। আর একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক সুগত মারজিত বলছেন তিনি 'সরকারের কাছের লোক' তাই তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করা হয়েছে। সাধু! উপাচার্যের পদটি তো রাজনৈতিক নয়। সে ব্যাপারে তাঁর কোনো অভিমত এখনও জানা যায়নি। শিক্ষাক্ষেত্রের সর্বত্র এমন ভয়ঙ্কর দুঃশাসন আমরা কল্পনা করতে পারি না।

পুরাকথার রাজা ক্যানিউট সমুদ্রের ঢেউগুলোকে থামতে বলেছিলেন। সেকথা স্বাভাবিকভাবেই সমুদ্র শোনেনি। বাংলার শিক্ষামন্ত্রীর চেষ্টা, প্রতিশ্রুতি, কথাবার্তা এবং আচরণে মনে হচ্ছে তিনি আজ রাজা ক্যানিউটের ভূমিকায় অবতীর্ণ। রাজ্যের সর্বত্র শিক্ষাঙ্গনের অন্যায়-অনাচার তাঁর দলের ছাত্র-সংগঠনের নেতাদের আস্ফালনে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ছে। আর তিনি শাসকের তর্জনী তুলে সমুদ্রতরঙ্গ স্তব্ধ করার চেষ্টা করছেন! কালের মন্দিরা তিনি শুনতে পাচ্ছেন না। শুনবার মতো কান থাকলে তিনি জানতেন রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রের বারোটা বেজে গেছে! ■

অদ্ভুত অন্ধকারে এক মুঠো জোনাকি

শিবশম্ভু পাল

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যা ঘটল তার তাৎপর্য যথেষ্ট। গত ৬ সেপ্টেম্বর আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ক সার্কাস চত্বরে কলা বিভাগের নবীন বরণ অনুষ্ঠান ছিল। বাংলা-ইংরেজি-ইতিহাস-ভূগোল প্রভৃতি বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছিলেন। উপাচার্যকে আমন্ত্রণ জানাতে যান তারা। উপাচার্য আবুতালেব খান সংগঠকদের অনুরোধ করেন তারা যেন ওই চত্বরের অন্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীদেরও এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বলেন। তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। চত্বরের অন্যান্য বিভাগ বিশেষত আরবি ও ইসলামি ধর্মতত্ত্বের ছাত্ররা অনুষ্ঠানের আয়োজকদের সঙ্গে কথা বলতে আসেন— কি কি করা হবে জানার পর আপত্তি জানান। নাচ-গান ইসলামি ঐতিহ্যে অনুমোদিত নয়— ওসব করা চলবে না। এ নিয়ে তীব্র বিতর্ক-বিতণ্ডা হয়। চড়াও ছাত্ররা তখন কলা বিভাগের ছাত্রীদের বিশেষভাবে বেছে নিয়ে তাদের বেশ-বাস নিয়ে কটাক্ষ, আপত্তি জানাতে থাকেন।

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সমস্ত ছাত্রছাত্রীই মুসলমান। ছাত্রীদের সহবতের অভাব আছে বলেও মনে হয় না। তবু ওই আক্রমণাত্মক ছাত্ররা তীব্র ভাষায় ছাত্রীদের বেশভূষা নিয়ে প্রবল আপত্তি করতে থাকেন। কলাবিভাগের ছাত্ররা তাদের সহপাঠীদের অপমান সহ্য করেননি। এই টানাপোড়েনের মধ্যে ৬ সেপ্টেম্বর এসে যায়। উপাচার্য মশাই এই ধুন্ধুমার কাণ্ডে এসে পড়লে মৌলবাদী ছাত্ররা তাঁকে ঘেরাও করেন। কেন ছাত্রীরা খোলামেলা পোশাক পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবে— কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কেন কিছু বলছেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা সামলাতে গেলে তাঁরাও হামলা থেকে বাঁচেননি। তাঁদের 'ড্রেস কোর্ড' নিয়েও আপত্তি করতে ভোলেননি তারা! উপাচার্য যেন অবিলম্বে এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফরমান' (সারকুলার) জারি করেন— সেই দাবি ওঠে। অনুষ্ঠান ভণ্ডুল হয়ে যায়। পরদিন মৌলবাদী ছাত্ররা তাদের দাবি নিয়ে আর একবার রাজারহাট চত্বরে উপাচার্যকে ঘেরাও করেন। যাবার সময় পার্কসার্কাস চত্বরে ছাত্রীরা আর একপ্রস্থ হেনস্থা হন।

৮ সেপ্টেম্বর ঘটে একটি অভাবিতপূর্ব ঘটনা। উপর্যুপরি হেনস্থার প্রতিবাদে ছাত্রীরা রাজারহাট চত্বরে যান— উপাচার্যকে ঘেরাও করেন তারা। তাদের সঙ্গে থাকেন তাদের সহপাঠীরা। কলকাতা হাই মাদ্রাসাকে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য— বিশ্ববিদ্যালয় আইন লাগু হয় বাম সরকারের সময়। স্থির হয়েছিল সংখ্যালঘু বিদ্যার্থীদের চাহিদা মেটাতে এই বিশ্ববিদ্যালয়। সংখ্যালঘু বলতে শুধু মুসলমান নয়— বাংলায় জৈন-বৌদ্ধ-খ্রিস্টধর্মাবলম্বীরাও সংখ্যালঘু। আলিয়াতে তাদের কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই। কেন নেই? জবাব দেবেন কি তখনকার বাম ও এখনকার তৃণমূল সরকার? যাইহোক, বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রথম মেয়েরা সম্ভ্রম রক্ষার দাবিতে আন্দোলন করলেন। জন্মসূত্রে তাঁরা সবাই মুসলমান। তবু তাঁদের আরো ভালো মুসলমান হবার পরামর্শ এল ধর্মতত্ত্বের ছাত্রদের কাছ থেকে! আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আসল উদ্দেশ্য— যা এতদিন আড়াল ছিল— প্রকাশ্যে এসে পড়ল। ব্যাপারটা ব্যতিক্রমী।

তবে গণমাধ্যমের ব্যবহার মোটেই ব্যতিক্রম ছিল না। কোনো টিভি চ্যানেলেই ৬-৭ তরিখের কোনো সংবাদ প্রকাশ হয়নি। ৮ তারিখ দায়সারা গোছের সংবাদ পরিবেশন করে দু'একটি চ্যানেল। খাপছাড়া ভাবে দেখানো যেসব খবর দেখে বিশেষ কিছু বোঝা যায় না। পরদিন সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিকে যা ছাপা হয় তা দেখে আন্দোলনকারী ছাত্রীরা তো বটেই অনেক অধ্যাপকও 'তাজ্জব' হয়েছেন। 'নির্ভীক নিরপেক্ষ' সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে ছাত্রীরা নাকি ডিসকো নাচ করার দাবিতে আন্দোলন করেছেন! ভেবে দেখলে বোঝা যায় এই সব খবরের কাগজও ইসলামি ধর্মতত্ত্বের কট্টর প্রবক্তাদের মতোই কলাবিভাগের ছাত্রীদের আরো ভালো মুসলমান হবার পরামর্শই আকারে ইঙ্গিতে জানাচ্ছেন। সম্পাদকীয় স্তম্ভের উপর 'বন্দে মাতরম্' ছাপানো এইসব সংবাদপত্র ভারতীয় জাতীয়তার প্রবল বিরোধী, উত্তরপ্রদেশে গো-মাংস রাখা, কুরবানি করা এক ব্যক্তির জনরোষে মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে এদের বেদনার সীমা নেই। গুজরাটের দলিত বিরোধী ঘটনা নিয়েও তাদের অবস্থান সনাতন ভারতীয় সমাজকে কেটে টুকরো করার লক্ষ্যে নিবেদিত। যাইহোক, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাটি যেভাবে তাদের চতুর ছলাকলায় ধরা পড়েছে তাতে বোঝা যায় এরা কোন স্তরের দেশ-বিরোধী শক্তি। গোটা ঘটনায় একটি রুপোলি রেখা চোখে পড়ছে। বাংলার মুসলমান তরুণীরা আর বেশিদিন মৌলবাদী কট্টরপন্থী ধর্মের ধ্বজাধারীদের কথা মানবেন না। দুটি প্রসঙ্গে সামান্য কথা বাকি আছে। পার্কসার্কাস চত্বরের ধর্মধ্বজাধারীদের দাবি— কেন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে? খুবই কম সংখ্যক হিন্দু বহু বাধা পেরিয়ে যোগ্যতা দেখিয়ে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পেয়েছেন। রাজ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশধারীরা এসব ব্যাপারে চোখে ঠুলি পরে থাকেন। ওই মৌলবাদীরা দাবি তুলেছেন অবিলম্বে হিন্দুদের বরখাস্ত করতে হবে! ব্যাপারটি নিয়ে কোনো তরফে কোনো উচ্চবাচ্য নেই! বছর কয়েক আগে এক তরুণী— যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী— হাওড়া জেলার বনেদি মুসলমান পরিবার থেকে আসা যথেষ্ট মেধাবী এক চাকরিরতা শিক্ষিকাকে কয়েকদিন কাজ করার পর, তাঁকে বলা হয় পোশাক-পরিচ্ছদ বদলাতে হবে। ওই তরুণী ব্যক্তিত্বময়ী--- তাকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী বলেই আশালীন পোশাক পরার দুর্নাম দেওয়া যাবে না। তবু তিনি মৌলবাদীদের ফরমান মানেননি। শেষপর্যন্ত চাকরি ছেড়েছেন। এইসব জোনাকির মতো আলো— অদ্ভুত আঁধার হয়ে আসা বাংলায় দেখা যাচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টে যে মহিলারা পুরুষদের একতরফা তালাকের বিরুদ্ধতা করে আইনি সংগ্রাম করছেন তাদের পাশে এইসব খদ্যোত (অর্থাৎ জোনাকি)-এর পুঞ্জ জ্বলে উঠুক। একদিন এ থেকে মুক্তির মশাল জ্বলবে কিনা ভবিষ্যৎ বলবে। ■

চিঠিপত্র

হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই পশ্চিমবঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ জাতীয় সঙ্গীতে লিখেছেন— দ্রাবিড়, উৎকল, বঙ্গ। আবার লিখেছেন 'বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি'। ডি. এল. রায় লিখেছেন 'বঙ্গ আমার জননী আমার'। প্রথম আমরা বাংলা নাম পাই যখন সম্রাট আকবর রাজা মানসিংহকে সুবে বাংলার শাসনকর্তা হিসেবে পাঠান। আবার ইতিহাসে পড়েছি বাংলা অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ রাঢ় গৌড় বারেন্দ্র হরিকল প্রভৃতি নামে বিভক্ত ছিল এবং ঢাকার সন্নিহিত অঞ্চলকেই বঙ্গ বলা হোত। তাহলে পশ্চিমবঙ্গ নামটি হলো কেন? বিংশ শতাব্দীর আরম্ভে বঙ্গ বিভাগের পর একটা স্বাদেশিকতার জোয়ার আসে। অধিকাংশ মুসলমান এই জোয়ারে গা ভাসায়নি। আগা খাঁ, আলি ভ্রাতৃদ্বয় এটাকে হিন্দুত্বের জাগরণ বলে মনে করল এবং মূলস্রোত থেকে দূরে সরে গেল। তারপর গান্ধীর আগমন থেকে তাদের মূলস্রোতে আনার জন্য নির্লজ্জ ভাবে তোষণ শুরু হলো। শুধু গান্ধীকে দোষ দিয়েই লাভ কী, চিত্তরঞ্জন দাসের হিন্দু-মুসলমান চুক্তি ও আরো অনেক নেতাও এই অপকর্ম থেকে মুক্ত ছিলেন না। তারপর ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ভোটে মুসলিম লীগের শাসন কায়েম হলো এবং হিন্দুদের দুর্দশা শুরু হলো। তারপর মুসলমানরা তথা মুসলিম লীগ নিজস্ব আলাদাভূমি আদায়ে বাংলা তথা ভারতবর্ষে গণহত্যা বা দাঙ্গা শুরু করল। কংগ্রেস নীরব দর্শক হয়ে রয়ে গেল, কোনো সক্রিয় ভূমিকা নিল না, যদিও কংগ্রেস হিন্দুদের ভোটে নির্বাচিত হয়েছিল। ১৯৩৯ সালে সমগ্র বাংলায় মুসলমান সরকার দাঙ্গা বা গণহত্যা সংঘটিত করে। তারপরে ১৯৪৬ সালে ১৬ আগস্ট কলকাতায় সরকারি প্ররোচনায় নিরীহ অপ্রস্তুত হিন্দুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কয়েক হাজার হিন্দুদের হত্যা করে ও লুটপাট শুরু করে। তারপর ওই বছরই নোয়াখালী-সহ সমগ্র বাংলায় বীভৎস গণহত্যা সংঘটিত করে ঘরবাড়ি দোকান ও অন্যান্য সম্পত্তি লুটপাট করে ও মহিলাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে--- শুধু বাংলাকে মুসলমানদের দখলে রাখা ও পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য। কংগ্রেসীনেতাদের মেরুদণ্ডহীন রাজনীতি ও কমিউনিস্টদের দেশদ্রোহিতার ফলে পুরো বাংলাটাই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছিল। ব্রিটিশরা বাঙালি বিপ্লবীদের নাকানিচোবানিতে প্রভূত অসন্তুষ্ট হয়েছিল এবং নেহরুজী একচ্ছত্র ক্ষমতা লাভের আশায় ও বাঙালি নেতারা তাঁর অসার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সরব হওয়ায় তিনিও বাংলাকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন। তখন শ্যামাপ্রসাদ, নির্মলচন্দ্র চ্যাটার্জী তথা হিন্দুমহাসভার আন্দোলন বা দূরদর্শিতার ফলে বাংলা ও পঞ্জাব বিভক্ত হলো। যে কারণে ভারত বিভক্ত হলো সেই একই কারণে বাংলা ও পঞ্জাবকে বিভক্ত করার দাবি তুলল। তখন মুসলিম লীগ সরকার, ব্রিটিশ ও নেহরু সেই দাবি অগ্রাহ্য করতে পারল না। ফলে বাংলা পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তানে বিভক্ত হলো। এখন পূর্ব বাংলা তথা পূর্বপাকিস্তান বাংলাদেশ নামে বিশ্বে পরিচিত। তাঁরা নিজেদের বাংলাদেশি বলে প্রচার করে। যাই হোক, এই পশ্চিমবঙ্গ হওয়ার ফলে পূর্ব বাংলার হিন্দুরা শত অত্যাচার সহ্য করেও ভারতে আশ্রয় পেয়েছেন ও ভবিষ্যতে পাবেন বলে আশা করি। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ নামের সঙ্গে একটা দুঃখজনক ইতিহাস আছে, বহু বাঙালি পুরুষ ও নারীর অত্যাচারের কাহিনি বিশেষ করে নারীদের নির্মম অত্যাচারের ঘটনা আছে যা আগামী প্রজন্মের চিন্তার খোরাক জোগাবে। আর বাংলা নাম হলে পশ্চিম বাংলাদেশ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকবে যার জন্য জিহাদি গোষ্ঠী এখন থেকেই সচেষ্ট। পূর্ববর্তী ও বর্তমান রাজ্যসরকার সুরাবর্দীর সরকারকেও ছাড়িয়ে গেছে। সুতরাং হিন্দুদের অস্তিত্বের রক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ নাম রাখা একটি জরুরি পদক্ষেপ। এখন অনেকে বলবেন পূর্ব পঞ্জাব যদি পঞ্জাব হতে পারে তাহলে পশ্চিমবাংলা বাংলা হতে দোষ কোথায়? পঞ্জাবে লোক বিনিময় হয়েছিল যার ফলে পঞ্জাবে এখন ২ শতাংশ মুসলমান আর বাংলায় লোক বিনিময় হলো না শরৎচন্দ্র বোস, কিরণশঙ্কর রায়েদের কারণে। এই নির্বুদ্ধিতার ফলে আজ পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩০ শতাংশ মুসলমান আর বাংলাদেশে ৭ শতাংশ হিন্দু।

—**কমল মুখার্জী,**
চুঁচুড়া, হুগলী।

পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা একটু ভাবুন

ওপার বাংলায় হিন্দু জনসংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে বলে এপার বাংলার অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে এভাবে চললে একদিন বাংলাদেশ হিন্দু শূন্য হয়ে যাবে। কিন্তু খাস পশ্চিমবঙ্গে যে হিন্দুরা সংখ্যা মারাত্মক ভাবে কমে যাচ্ছে, পক্ষান্তরে পশ্চিমবাংলার এই মুসলমান জনসংখ্যা বিপজ্জনক ভাবে বেড়েই চলেছে সে সম্বন্ধে তাঁদের কোনো উচ্চ-বাচ্য শোনা যায় না। পশ্চিমবাংলার এই মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও হিন্দু জনসংখ্যার হ্রাসের ফলে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে চলেছে সে সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের এই নির্লিপ্ততা খুবই আশ্চর্যজনক। তাঁরা শুধু ব্যস্ত ধর্মনিরপেক্ষতা আর কল্পিত সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে।

দেশ বিভাগের আগে যখন নেহরু গোটা বাংলা ও পঞ্জাবকে পাকিস্তানে ঠেলে দিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসতে উদ্যত তখন ড. শ্যামাপ্রসাদ বহু কষ্টে ও চেষ্টায় বাংলার হিন্দুদের বাঁচাবার জন্য এই ক্ষুদ্র পশ্চিমবঙ্গকে জিন্না তথা মুসলিম লীগের করাল গ্রাস থেকে উদ্ধার করেন। তখন

পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৮১ শতাংশ আর মুসলমান ১৯ শতাংশ। তারপর সাবেক পূর্ববাংলা থেকে প্রায় ২ কোটি হিন্দু উৎখাত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরে এই কয়েক দশকের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু জনসংখ্যা মারাত্মক ভাবে কমে গেছে। এবং রোজই কমছে— ৮১ থেকে কমে এখন ৭০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। পক্ষান্তরে মুসলমান জনসংখ্যা ১৯ থেকে বেড়ে এখন হয়েছে ৩০ শতাংশ। এভাবে চললে আর কয়েক দশক পরে পশ্চিমবাংলার মুসলমানরা সংখ্যালঘু থেকে সংখ্যাগুরুতে পরিণত হবে।

মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও উত্তর দিনাজপুর জেলা ইতিমধ্যে মুসলমান সংখ্যাগুরু জেলাতে পরিণত হয়েছে। এর জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী তাদের গর্ব অনুভব করতে বলেছেন। এভাবে পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলিও যদি মুসলমান মেজরিটিতে পরিণত হয় তখন তাঁকে আর গর্ব অনুভব করতে বলতে হবে না— তিনি শূন্যে বিলীন হয়ে যাবেন।

পশ্চিমবঙ্গ যে ভাবে মুসলমান মেজরিটিতে পরিণত হতে যাচ্ছে তার প্রধান কারণ অনুপ্রবেশ নয়, মুসলমানদের মধ্যে অতি উচ্চ জন্মহার। হিন্দু পরিবারে যেখানে সন্তান সংখ্যার গড় এক বা শূন্য সেখানে মুসলমান পরিবারে তা কমপক্ষে ১০/১২। তা পরিবারের কর্তা যদি ভূমিহীন দিনমজুর, কিংবা বেকার বা স্বাবলম্বী হন তাহলেও। পরিবার পরিকল্পনার যাবতীয় ব্যবস্থা সব হিন্দুদের জন্য। ভোটের ভয়ে মুসলমানদের তার বাইরে রাখা হয়। তাই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের বৈষম্য যদি এখনই দূর করা না যায় তবে অচিরেই পশ্চিমবাংলায় হিন্দুরা সংখ্যালঘু ও মুসলমানরা সংখ্যাগুরু হয়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

—**সুহাস বসু,**
বেহালা, কলকাতা-৭০০০৬০।

কাশ্মীর হওয়ার পথে পশ্চিমবঙ্গ

সংবিধানে ভারত 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র' বলে ঘোষিত। অথচ পশ্চিমবঙ্গ ও কাশ্মীরে মুসলমানদের নানা সরকারি সুবিধা একতরফাভাবে দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে ইমামদের ভাতা, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ঢালাও অনুমোদন, মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক সাহায্য, হজযাত্রীদের আর্থিক অনুদান ইত্যাদি দিয়ে বাস্তবিক ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখা যাচ্ছে না। বরং বিভেদের রাজনৈতিক অপকৌশলের সাহায্যে গদিতে টিকে থাকার এক ভয়ঙ্কর খেলায় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে। এবং এই আশকারা পেয়ে মুসলমানরা এখনই দেগঙ্গা, ডায়মন্ডহারবার, উস্তি, মুর্শিদাবাদ, নৈহাটি, চণ্ডীতলা, মল্লিকপুর, তেহট্ট, ক্যানিং-সহ বহু স্থানে হিন্দুদের উপর আক্রমণ চালিয়ে হতাহত, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন, নারীর শ্লীলতাহানি করে আতঙ্কের সৃষ্টি করছে। অথচ সরকারি নির্দেশে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম প্রকৃত ঘটনাসমূহ চেপে যাচ্ছে।

এসব কী ধর্মনিরপেক্ষতা না কী সংখ্যালঘু তোষণ! ভোট পাওয়ার এ এক ঘৃণ্য কৌশল।

এদিকে রাজ্য সরকারের প্রশ্রয়ে অনুপ্রবেশ, একাধিক বিয়ে, হিন্দুমেয়েদের ফুসলিয়ে নিয়ে ধর্মান্তরিত করে বিয়ে ইত্যাদি বহু উপায়ে মুসলমানরা দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি করে পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার ভারসাম্য পরিবর্তন করছে। ফলে রাজনীতিতে তাদের প্রভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা মোটেই মঙ্গলজনক নয়। দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত খণ্ড করে পাকিস্তান সৃষ্টি এক দুঃসহ ইতিহাস, যা ভারতকে এযাবৎ নাজেহাল করছে। সেই একই পদ্ধতিতে পশ্চিমবঙ্গ ক্রমেই অপ্রতিরোধ্য গতিতে ইসলামি শাসনের পথে এগুচ্ছে। ব্যক্তি ও দলীয় ঘৃণ্য স্বার্থান্বেষণে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ তাদের কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে।

আমরা এই ভয়াবহ আগামী দিনের কথা ভেবে আতঙ্কিত। পাকিস্তান ও বর্তমান বাংলাদেশ থেকে দেশান্তরি আমরা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে শরণার্থীসহ এদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ সেই অবস্থায় কোথায় আশ্রয় পাবে?

তাই সচেতন ও সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে দুর্বার প্রতিরোধ এখনই প্রয়োজন। বিলম্বে দেশ ও জাতির সর্বনাশ ঘটবে।

—**অক্ষয় কুমার দাশ,**
দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগনা।

কংগ্রেসের ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট

গত ২৮ আগস্টে কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইংরাজি দৈনিক পত্রিকায় একটি খবর পড়ে বেশ কৌতুক অনুভব করলাম! উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব ইত্যাদি কয়েকটি প্রদেশের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের কংগ্রেসের টিকিট প্রার্থীরা তাদের মুখ্য কার্যালয় ২৪নং আকবর রোডে আর ভিড় করছেন না। সেখানে কার্যকর্তারা বসে বসে মাছি তাড়াচ্ছেন। সবাই ছুটছেন ইভেন্টম্যানেজার প্রশান্ত কিশোরের দরজায়। বুঝুন ব্যাপারটা! কী হাল হয়েছে পার্টিটার! নির্বাচন-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ঝুঁকি কেউ নিতে চাইছেন না বা সাহস পাচ্ছেন না; তাই নির্বাচনের কাজকর্মের মুখ্যদায়টা আউট-সোর্স করে দেওয়া হয়েছে প্রশান্ত কিশোর অ্যান্ড কোং-কে।

সিনেমা, থিয়েটারে দেখা যায় অলস এবং বিসালপ্রিয় জমিদারবাবু দেওয়ানজী, মুনিমজীদের উপর জমিদারির দায়দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিজে আমোদফুর্তিতে মেতে থাকে। ব্যাপারটা যেন অনেকটা সেইরকম। 'উত্তরপ্রদেশ' 'পঞ্জাব' মহালদুটোর অবস্থা বেশ খারাপ। পুরানো খাস্ দেওয়ানজী, মুনিমজীদের দিয়ে জমিদারির হাল ফেরানো যাচ্ছে না। এদিকে 'রাজমাতার' বয়স হয়েছে; 'রাজাবাবু'রও এত ঝুটঝামেলা ভাল লাগছে না। তাই প্রোফেশনাল দেওয়ানজী ভাড়া করা হয়েছে! যদি জমিদারির হালটা ফেরানো যায়। আর মোসাহেবের দল ছুটছে ভাড়া করা দেওয়ানজী শ্রীযুক্তবাবু প্রশান্ত কিশোরের বাড়ি! মানুষকে বোকা বানিয়ে এ জমিদারিটা আর কতদিন টিকবে? দেখা যাক।

প্রণব দত্ত মজুমদার,
কলকাতা-৪৮।

পরম্পরা

জ্যোতিপ্রতিমা দুর্গা

অমিত ঘোষ দস্তিদার

বাঙালি হিন্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ পূজা হলো দুর্গাপূজা। পূজার প্রাক্কালে একবার স্মরণ করা যাক দেবীর স্বরূপ। দেবী ভাগবতে বলা হয়েছে, একদিন আদ্যাশক্তি তাঁর নিজের শক্তি থেকে সরস্বতী, লক্ষ্মী ও গৌরীকে সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টির পর তিনি ব্রহ্মাকে প্রদান করলেন সরস্বতী, বিষ্ণুকে প্রদান করলেন লক্ষ্মী এবং মহাদেবকে প্রদান করলেন গৌরী। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের এই ত্রিদেব আদ্যাশক্তি কর্তৃক প্রাপ্ত তিনশক্তির মাধ্যমে তাঁদের কার্য সম্পন্ন করতেন। এক সময় হরি ও হরের সঙ্গে হলা এবং হল নামে দুই দানবের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে তাঁরা ওই দুই দানবকে পরাজিত করেন। কিন্তু হরি এবং হরের মনে এই যুদ্ধের পর থেকে প্রচণ্ড অহঙ্কারের সৃষ্টি হয়। তাঁদের দু'জনের মনে এই ধারণা তৈরি হয় যে, শুধুমাত্র তাঁদেরই অমিত-পরাক্রমে হলা-হল পরাজিত হয়েছে। হরি তাঁর নিজ শক্তি লক্ষ্মীর কাছে এবং হর তাঁর নিজশক্তি গৌরীর কাছে দাম্ভিকতার সঙ্গে ব্যক্ত করেন। তাঁদের বৃথা অহঙ্কার দেখে গৌরী হরকে এবং লক্ষ্মী হরিকে উপহাস করলেন। হরি এবং হর ক্রোধের বশে লক্ষ্মী এবং গৌরীকে কটুকথা দ্বারা অপমানিত করলে অভিমানী তাঁরা হরি এবং হরকে ত্যাগ করে চলে গেলেন। কিন্তু নিজ নিজ শক্তি বিনা হরি ও হর তেজহীন হয়ে পড়লেন। তখন ব্রহ্মা তাঁর মানসপুত্র দক্ষ, মনু, সনকাদিকে তপস্যার মাধ্যমে ওই দেবী শক্তিদের তুষ্ট করার আদেশ দিলেন। ব্রহ্মার নির্দেশমতো মানসপুত্রেরা দেবীদের আরাধনা করলেন। সেই আরাধনায় দক্ষ দেবী গৌরীকে কন্যারূপে কামনা করলেন। আরাধনায় তুষ্ট হয়ে দেবী গৌরী সতীরূপে দক্ষগৃহে জন্মগ্রহণ করলেন। বড়ো হয়ে দেবী সতী দেবাদিদেব মহাদেবকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করেন। কন্যার মনের কথা জেনে দক্ষ শিবের কাছে যান এবং শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মার অনুরোধে মহাদেব সতীকে বিয়ে করতে রাজি হন।

পদ্মপুরাণ মতে, দেবী পার্বতী মাতৃকাদের মধ্যে বৈষ্ণবী নামে খ্যাতা। দেবী দুর্গা যখন অসুর বিনাশে ব্যস্ত, সেই সময় তাঁর প্রধান তিনটি রূপ যথাক্রমে মাতা মহাকালী, মাতা মহালক্ষ্মী ও মাতা মহাসরস্বতী তাঁদের সম্মিলিত তেজোশক্তির সাহায্যে এক আলোকবৃত্তের সৃষ্টি করেন এবং সেই তেজোময় আলোকবৃত্ত থেকে যে প্রকাশিত রূপের আবির্ভাব হয় তিনিই বৈষ্ণবী। এই বৈষ্ণবী বা বৈষ্ণোদেবী মাতা ভগবতীর ন'টি রূপের মধ্যে একটি। মাতা ভগবতীর ন'টি রূপ হলো— মাতা বৈষ্ণোদেবী, মাতা চামুণ্ডাদেবী, মাতা কাংড়েওয়ালী দেবী বা মাতা ব্রজেশ্বরীদেবী, মাতা জ্বালামুখীদেবী, মাতা চিন্তপূরণীদেবী, মাতা নয়নাদেবী, মাতা কালিকাদেবী, মাতা মনসাদেবী এবং মাতা শাকম্ভরীদেবী। মানবমনের কুপ্রবৃত্তি ধ্বংস করে সত্যের পথে চালিত করেন মাতা বৈষ্ণোদেবী। শিব ও শক্তির মিলিত আশিস প্রদান করেন মাতা চামুণ্ডাদেবী, শত্রু ধ্বংস করে মানুষের জীবনে শান্তিবারি বর্ষণ করেন মাতা কাংড়েওয়ালীদেবী বা মাতা ব্রজেশ্বরীদেবী। রোগ-শোক থেকে মানুষকে রক্ষা করেন মাতা জ্বালামুখীদেবী। দুশ্চিন্তা দূর করেন এবং মানুষ ভালো কিছু ভাবলে সেই ভাবনাকে পূর্ণতা দান করেন মাতা চিন্তপূরণীদেবী বা মাতা চিন্তাপূর্ণীদেবী। জ্যোতি প্রদান করেন মাতা নয়নাদেবী। আদিশক্তি দ্বারা অশুভ প্রভাব দূর করে থাকেন মাতা কালিকাদেবী। মানুষের মনস্কামনা অর্থাৎ মনের আশা পূর্ণ করেন মাতা মনসাদেবী (ইনি কিন্তু সর্পদেবী নন)। অকাল মহামারী থেকে মানবকে রক্ষা করেন মাতা শাকম্ভরীদেবী।

সপ্তসতী চণ্ডীগ্রন্থের দেবীকবচের

সূচনায় দেবীর ন'টি নাম— প্রথমং শৈলপুত্রীতি, দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণী, তৃতীয়ং চণ্ডকটেতি, কুষ্মাণ্ডেতি চতুর্থকম্, পঞ্চমং স্কন্দমাতেতি ষষ্ঠং কাত্যায়ণীতথা, সপ্তমং কালরাত্রীতি মহাগৌরীতি চাষ্টমম্। নবমং সিদ্ধিদাত্রীতি নবদুর্গাঃ প্রকীর্তিতা।

শাস্ত্রবচন— দুর্গা। 'দ' শব্দটি দৈত্যনাশক, 'উ'-কার বিঘ্ননাশক, 'রেফ'—রোগঘ্ন, 'গ'-কার পাপঘ্ন এবং 'আ'-কার ভয় ও শত্রুঘ্ন। দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, পাপ এবং ভয় ও শত্রু হতে যিনি রক্ষা করেন, তিনি— দুর্গা।

মতান্তরে— 'দুর্গ' শব্দটি দৈত্যবাচক এবং 'আ'-কার নাশবাচক, যিনি দুর্গ নামক অসুরকে নাশ করেন তিনিই নিত্য দুর্গানামে প্রকীর্তিকা। 'দুর্গ' শব্দটি আবার বিপত্তিবাচক, 'আ'-কার নাশবাচক, তিনি বিপত্তারিণী— তিনিই দুর্গা।

স্কন্ধপুরাণে— রুরু দৈত্যের পুত্র দুর্গাসুরকে বধ করায় দেবী বিশ্বলোকে পরিচিতা হয়েছেন 'দুর্গা' নামে। শরণাগত দেবগণের প্রার্থনায় দেবাদিদেব শঙ্করের নিয়োগক্রমে দেবী দুর্গা ওই অসুরকে বধ করেন।

শ্রীশ্রী চণ্ডীতে— 'তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যাং মহাসুরম্/ দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি'। অর্থাৎ দুর্গম নামক মহাসুরকে বিনাশ করে আমি প্রসিদ্ধা হব দুর্গাদেবী নামে।

দুর্গাদেবীর প্রকৃত রূপ— দুর্গার সামগ্রিক রূপ হলো রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান। লক্ষ্মী ধনশক্তি বা বৈশ্যশক্তি। গণেশ গণশক্তি (জনশক্তি) বা শূদ্রশক্তি বা শ্রমশক্তি। সরস্বতী জ্ঞানশক্তি বা ব্রহ্মণ্যশক্তি। কার্তিক ক্ষাত্রশক্তি।

বৃহত্তর অর্থে— বৃহত্তর অর্থে দুর্গা প্রতিমা হলো আমাদের জাতি-প্রতিমা। এই সত্যকে অনুধাবন করেই বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত রচনা করেছিলেন।

আধ্যাত্মিকতার দিকে—সৃষ্টি বা উৎপত্তিতে— সত্ত্ব, রজ, তম— এই তিন গুণের সমাহারে যা হয় তাকেই বলা হয় মহত্তত্ত্ব। মহত্তত্ত্ব থেকে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক— এই তিনরকম অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। দেবীর পায়ের নীচের সিংহ রজোগুণের এবং সিংহাক্রান্ত অসুর তমোগুণের প্রতীক। সত্ত্বগুণময়ী দুর্গা নিয়ন্ত্রিত করছেন রাজোগুণের দ্যোতক সিংহকে এবং সিংহ শাসন করছে তমোগুণাত্মক মহাসুরকে। দৈবীভাবের সঙ্গে আসুরিকতার সংগ্রাম।

সংহতি সাধনার প্রতীক— দুর্গা অদ্বৈত-তত্ত্বময়ী। পরম অদ্বৈততত্ত্বের মধ্যেই নিহিত আছে অখণ্ড ঐক্যের মূর্ত ভাবনা। দেবী হলেন সমষ্টি শক্তিরূপিণী। দেবীর তত্ত্ব ও তাঁর মহাপ্রকাশ তথা দিব্যলীলা সংহতি সাধনার উজ্জ্বল-স্বরূপ।

সমাজোন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ চিন্তনে— সমাজের সমস্ত শ্রেণীর মানুষের সাহায্য নিয়েই দুর্গাপূজা সম্পূর্ণতা লাভ করে। ব্রাহ্মণ, মালী, কুম্ভকার, তন্তুবায়, নরসুন্দর, সভাসুন্দর, ঋষিদাস, বারবণিতা— এইভাবে সব মানুষেরই বিশেষ ভূমিকা স্বীকৃতি পায় দেবীর মহাপূজায়। তাই একমাত্র এই উৎসবে জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা পূর্ণতা পায়।

মাতা দুর্গা আবির্ভূতা হন— সিংহবাহিনী মা শ্রীশ্রীদুর্গা দশপ্রহরণ ধারণ করে আসুরী শক্তিকে প্রতিনিয়ত পরাজিত ও নির্মূল করে বিশ্বজগতে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা প্রতিনিয়ত বজায় রেখে চলেছেন। প্রতিটি আরাধ্য স্থানে মৃণ্ময়ী মাতৃপ্রতিমা দশভুজা চিন্ময়ী মহামায়া মাতা দুর্গা আবির্ভূতা হন। ভারতবর্ষের বর্ণাশ্রম— সমাজ এবং রাষ্ট্র— দানব-দলনী, মহিষাসুর-মর্দিনী দেবীদুর্গার পূজারতি-আবাহনকালে মাতৃস্নেহ হৃদয় দিয়ে অনুভব করে। ধর্মপিপাসু অজস্র নরনারী আকুল-ব্যাকুল প্রাণে মায়ের কাছে একান্তে তাদের মনের কথা বলেন।

দেবী দুর্গার বাস্তব রূপ— হিন্দুজাতি মহাশক্তির পূজারি। তারা মা দুর্গার কাছে সবসময় চায় শক্তি, শান্তি ও মুক্তি। দেবী দুর্গার বাস্তব রূপ হলো বিশ্বের সমগ্র হিন্দু সমাজ। দেবী দুর্গার বোধন হলো হিন্দুজাতির মহাজাগরণ। হিন্দুজাতি তথা মানবজাতির মহান কল্যাণার্থে সর্বশক্তি-সমন্বিতা, সর্বশক্তিময়ী জগন্মাতা দেবী দুর্গা হলেন— ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের জাতি-মাতৃকা শ্রীশ্রীদেবী দুর্গা।

ঋণ : ওঁ হিন্দুত্বম—স্বামী বেদানন্দ ▯ প্রণব— মে ২০১৫ ▯ বর্তমান শারদসংখ্যা— ১৪৯৬ ▯ শ্রীগুরুসঙ্ঘ মাসিক পত্রিকা— কার্তিক ১৪২২।

HOW ₹1000 SIP CAN GROW IN A LONG TERM!!

Year	5	10	15	20	25	30
Total Amt.	60,000	1,20,000	1,80,000	2,40,000	3,00,000	3,60,000
8%	77,172	201,458	401,621	723,987	1,243,160	2,079,293
12%	81,104	224,036	475,931	919,857	1,702,207	3,080,973
15%	87,342	263,018	616,366	1,327,079	2,756,561	5,631,770
20%	98,704	344,311	955,460	2,476,194	6,260,267	15,676,252

Fights Market Volatility

DRS INVESTMENT

Contact : 9830372090, 9748978406

Email : drsinvestment@gmail.com

PMS | Mutual Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

CALL TODAY AND START SIP INVESTMENT

uti UTI Mutual Fund | HDFC MUTUAL FUND | SBI MUTUAL FUND A PARTNER FOR LIFE

Mutual Fund Investment Subject to Market Risk.

হিন্দু ধর্মের সম্প্রদায় ভেদ

রবীন সেনগুপ্ত

বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, বৈদান্তিক, প্রকৃতিপূজক ও মানবতাবাদী— এই আটটি সম্প্রদায় নিয়ে আমাদের এই মহান হিন্দুধর্ম।

এর মধ্যে বৈষ্ণবদের সংখ্যাই হিন্দুধর্মে সর্বাধিক। রাধাকৃষ্ণ ও রামসীতাকে যাঁরা মূল ইষ্ট দেবদেবী রূপে মান্য করেন তাঁরা বৈষ্ণব। রামসীতার উপাসকদের বলা হয় রামায়েত বৈষ্ণব। এছাড়াও রুদ্র বৈষ্ণব, শ্রীবৈষ্ণব, মধ্বাচার্য বৈষ্ণব, নিম্বার্ক বৈষ্ণব, গৌড়ীয় বৈষ্ণব এগুলি হলো বৈষ্ণবদের উপসম্প্রদায়গুলির মধ্যে প্রধান। আউল, বাউল, কর্তাভজা, নেড়ানেড়ি— এসব হলো সহজিয়া বৈষ্ণবের নানা বিভাগের নাম।

শৈব সম্প্রদায়রা ভগবান শিবকে মুখ্য আরাধ্য রূপে গণ্য করেন। সময়ে সময়ে অন্য দেবদেবীর পূজাতেও তাঁরা অংশ নেন। লিঙ্গায়েত শৈব, নাথ শৈব ইত্যাদি নানা ভাগ শৈবদের মধ্যে রয়েছে।

মাতৃ উপাসকদের শাক্ত নামে অভিহিত করা হয় হিন্দুধর্মে। মা দুর্গা, মা-কালীর উপাসকদেরই প্রধানত শাক্ত বলা হয়। একদিক দিয়ে ধরতে গেলে বৈষ্ণব ও শৈবদের মধ্যেও অপরিহার্য ভাবে মাতৃ উপাসনার প্রচলন রয়েছে। প্রতিটি বৈষ্ণবই রাধা লক্ষ্মী তুলসী ইত্যাদির পূজা করেন। ব্রাহ্মণরা গায়ত্রীর উপাসনা করেন। শিব ভক্তরাও মা দুর্গা ও কালীকে শিবেরই অবিচ্ছেদ্য শক্তি ও মায়াস্বরূপিণীরূপে মান্য করেন। শাক্ত সাধনা বৈদিক মন্ত্রে না করে যাঁরা তন্ত্র মন্ত্র দ্বারা সম্পন্ন করেন তাঁদের তান্ত্রিক বলা হয়।

বামাচারী, অঘোরাচারী, কৌলাচারী ইত্যাদি নানা বিভাগ তান্ত্রিকদের মধ্যে রয়েছে। বাংলা মুলুকে শাক্ত ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা সর্বাধিক। হিমালয় এলাকায়, বারাণসী এলাকায় শৈবরা বেশি সংখ্যায় অবস্থান করেন। মথুরা মণ্ডলে, অযোধ্যা এলাকায়, দ্বারকা, পুরী, তিরুপতি এলাকায় বৈষ্ণবরা রয়েছেন সর্বাধিক সংখ্যায়।

গাণপত্যরা ভগবান গণেশকে মূল করে অন্য দেবদেবীর পূজা করেন। মহারাষ্ট্র এলাকায় গাণপত্যের সংখ্যা সর্বাধিক।

যারা সূর্যদেবের উপাসক তাদের সৌর বলা হয়। সূর্য পূজাকে চলতি কথায় ছট পরব বলা হয়ে থাকে। হিন্দিভাষীদের মধ্যেই এই ছট পূজার প্রচলন সর্বাধিক। কিন্তু হিন্দুদের সমস্ত সম্প্রদায়ই স্নান করে উঠে সূর্য প্রণাম করেন।

বৈদান্তিক সম্প্রদায়গুলি নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করেন। তাঁরা বেদান্তকে তাঁদের মূল গ্রন্থ রূপে মান্য করেন, ঠিক যেমন বৈষ্ণবরা ভাগবতকে, শৈবরা শিব পুরাণকে ও শাক্তরা চণ্ডীদেবী পুরাণকে তাদের মূল গ্রন্থরূপে মান্য করেন। ওঙ্কার মন্ত্রই হলো বৈদান্তিকদের মূল মন্ত্র। রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্ম মূলত বৈদান্তিক সম্প্রদায়েরই একটি শাখা। আজ তারা ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়েছে।

প্রকৃতি পূজাও হিন্দুদের সব সম্প্রদায়ই কম বেশি করে থাকেন। গাছ, নদী, পাথর, চন্দ্র, সূর্য পর্বতকে প্রণাম— কোন হিন্দু না করে? কিন্তু প্রকৃতি পূজাকেই প্রধান করে যাঁরা জীবনচর্যা করেন তারা মুখ্যত ভারতের বনবাসী ও জনজাতি সম্প্রদায়।

মানবতাবাদী সম্প্রদায়রা আগে নিজেদের চার্বাক সম্প্রদায় রূপে অভিহিত করত। পরবর্তী কালে ইউরোপে মানবতাবাদী আন্দোলনের ঢেউ এদেশে এসে পৌঁছলে তারা নিজেদের মানবতাবাদী রূপে পরিচয় দিতে থাকে। এদের মুখ্য উপাস্য নাকি মানুষ। এদের অনেকেই নাস্তিক বা নিরীশ্বরবাদী হয়ে থাকে। কোনো কোনো মানবতাবাদী ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। তবে তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা খুবই কম থাকে বা একেবারেই থাকে না। এরা প্রায়শই আঁতেল তথা দেশদ্রোহীও হয়ে থাকেন। তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের একাংশই মূলত মানবতাবাদী গোষ্ঠীর প্রতিভূ।

এছাড়াও বৌদ্ধ, জৈন, শিখ— তাঁরাও হিন্দুদেরই সম্প্রদায়। কিন্তু তাঁরা সবাই সেকথা স্বীকার করেন না। স্বীকার না করলেও এই ধর্মগুলির উৎপত্তি ভারতেই এবং এদের মধ্যে ওঙ্কারের ব্যবহার, গুরুপূজা, পরজন্মে বিশ্বাস— এসবই রয়েছে হিন্দুদের অন্য সম্প্রদায়গুলির মতোই। ❙

প্রেরণা

নবাঙ্কুর

বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসনের তখন শিশুকাল। একদিন স্কুল থেকে বাড়িতে এসে এডিসন মা'কে একটি মুখবন্ধ খাম দিয়ে বলল— 'মা আমার শিক্ষক এই কাগজটি দিয়েছেন এবং এটি কেবল তোমাকেই দিতে বলেছেন।' শিক্ষকের দেওয়া সেই কাগজটি ছিল একটি চিঠি। মা চিঠিটি হাতে নিয়ে জোরে জোরে পড়তে লাগলেন— 'আপনার ছেলে অতীব মেধাবী, এই স্কুলটি তার জন্য ছোট এবং তাকে পড়ানোর জন্য যোগ্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক এখানে নেই। আপনি দয়া করে নিজেই তার শিক্ষার ব্যবস্থা করুন।' চিঠি পড়া শেষ হলে এ্যাডিশন দেখলো মায়ের চোখে জল।

তারপর বহু বছর কেটে গেছে। মা মারা গেছেন। এডিসন তখন বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানী। ইলেক্ট্রিক বাল্ব, গ্রামোফোন আরোও কত কী আবিষ্কার করেছেন। কাজের ফাঁকে একদিন তিনি তাঁর পারিবারিক পুরনো জিনিসপত্র দেখছিলেন। দেখতে দেখতে ড্রয়ারের মধ্যে একটি ভাঁজ করা কাগজ তাঁর চোখে পড়লো।

কাগজটি খুলে দেখলেন তাতে লেখা আছে— 'আপনার সন্তান স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন, আমরা তাকে আমাদের স্কুলে আসতে দিতে পারি না।'

লেখাটি পড়ার পর এডিসন কয়েক ঘণ্টা কাঁদলেন। তারপর নিজের ডায়েরিতে লিখলেন— 'টমাস আলভা এডিসন একজন স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন শিশু ছিল। কিন্তু একজন আদর্শ মায়ের দ্বারা তিনি শতাব্দীর সেরা মেধাবী হয়ে ওঠেন'।

সারা পৃথিবীর মায়েরা যুগে যুগে এমনই হন।

রনি চট্টরাজ

ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল—২০১১

আমাদের প্রিয় দল যদি খেলায় হেরে যায়, কিংবা যদি আমাদের প্রিয় খেলোয়াড় খারাপ খেলে তাহলে আমরা কী করি?

আমরা ভুলে যাই সে দলটি আমাদের, সেই খেলোয়াড়ও আমাদের। এমন অনেক দেখা গেছে যে, কোনো দল খেলায় হেরে গেছে দেখে হতাশায় নিজের দেশের লোকেরাই তাদের বোতল ছুড়ে মারছে। গালিগালাজ করছে। জিতে গেলেও ছবিটা একই রকম থাকে। আনন্দ উল্লাসে আমরা দৃষ্টিকটু কত কাজ করি। হেরে যাওয়া খেলোয়াড়দের কটুকথা বলি। এই ধরনের ঘটনা আকছার ঘটে। কিন্তু ২০১১ সালে ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবলে বিশ্ববাসী একটা অন্য চিত্র দেখেছে। সেবার জাপান হেরেছিল, অথচ জাপানের ফুটবলপ্রেমী লোকেরা এতটুকুও অভদ্রতা করেনি। তারা কেউ বোতল ছোড়েনি, মাঠ নোংরা করেনি; বরং যাওয়ার আগে সবাই গ্যালারি পরিষ্কার করে দিয়ে তবেই স্টেডিয়াম ছেড়েছিল।

রনি চট্টরাজ

ভারতের পথে পথে

অজন্তার গুহাচিত্র

মহারাষ্ট্রের অজন্তা পাহাড়ের গুহায় খোদাই করা চিত্র ভারতীয় শিল্পকলার এক প্রাচীন নিদর্শন। এগুলি খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে চিত্রিত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। অজন্তার দেয়ালে খোদিত এই চিত্রগুলিতে বুদ্ধের জীবনের নানা কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। চিত্রগুলির জীবন্ত রূপ দেখে মুগ্ধ হতে হয়। ভাবতে অবাক লাগে যে, এত বছর আগেও ভারতে কত সমৃদ্ধ রঙ ব্যবহার করা হয়েছিল। চিত্রগুলির প্রয়োগও অতি সূক্ষ্ম। পাথর কেটে খোদাই করা প্রায় তিরিশটি গুহাস্তম্ভ রয়েছে এখানে। দেশ বিদেশের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পীরা অজন্তার গুহাচিত্রকে এক বিস্ময় বলে মনে করেন। ১৯৮৩ সালে ইউনেস্কো অজন্তার গুহাচিত্রকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট' বলে ঘোষণা করে।

এসো সংস্কৃত শিখি

किमर्थं श्रीमन् ?

কেন মহাশয়?

प्राप्तं खलु ?

পেয়েছেন কি?

भवति किम् इति पश्याम: ।

হবে কিনা দেখব।

ज्ञातम् ?

বুঝেছেন?

कथम् आसीत् ?

কেমন ছিল?

ভালো কথা

মালদার বন্যা

আমি কখনো বন্যা দেখিনি। ঠাকুরদা ও বাবা-কাকার মুখে শুনেছি আগে নাকি প্রতিবছর বন্যা হতো। গ্রামের পর পর ভেসে যেত। মানুষের খুব কষ্ট হোত। সেই বন্যা এবার আমি দেখলাম। গঙ্গানদীর বাঁধ ভেঙে বীরনগর, লালুটোলা-সহ গ্রামের পর গ্রাম ভেসে গিয়েছে। বাবা, কাকা-সহ অনেক স্বয়ংসেবক রাতদিন ওই গ্রামগুলিতে ত্রাণ বিলি করছে। আমাদের এম এল এ স্বাধীন সরকারের বাড়ি ভেঙে গঙ্গায় পড়ে গেছে। আমিও একদিন বাবার সঙ্গে বীরনগর গ্রামে ত্রাণ বিলি করতে গিয়েছিলাম। গ্রামের লোকদের ত্রিপল, মাদুর, চিড়ে,খিচুড়ি দেওয়া হচ্ছে। আমাদের এল এল এ-ও ত্রাণশিবিরে সবার সঙ্গে খিচুড়ি খাচ্ছেন দেখলাম। আমারও খাওয়ার ইচ্ছা করছিল। বাবা বললেন— 'ওগুলো কেবল বানভাসী মানুষদের জন্য। আমরা বাড়ি গিয়ে খাব।' মানুষের দুঃখ দেখে আমার খুব কান্না পাচ্ছিল। দেওনাপুর, পারলালপুর, শোভাপুরের মানুষেরও নাকি খুব কষ্ট। সেখানেও আমার সেবাকাজ করতে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। বাবা বললেন তোকে আর নিয়ে যাব না।

ঋকদীপ কর্মকার, সপ্তম শ্রেণী।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) রি ই য়া জে

(২) ডু মি না ল

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) ক চি লা ত্র

(২) অ ষ ণ ন্বে

৫ সেপ্টেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) কমলেশ্বর (২) অবিনশ্বর

৫ সেপ্টেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) আরাবল্লী (২) নীলগিরি

উত্তরদাতার নাম

(১) রূপসা দেবনাথ, বিরাটি, কলকাতা-৪৯ (২) তুহিন কুমার বিশ্বাস, গাজোল, মালদা (৩) যাদব দাস, বরাবাজার, পুরুলিয়া

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

অঙ্গনা

আজকের নারীর দিশারি মা-সারদা

সুতপা বসাক ভড়

আজ আমরা নানান প্রচারমাধ্যমের ভূমিকা আমাদের জীবনে অস্বীকার করতে পারি না। বিলাস-ব্যসন, ভোগবাদী জীবন সহজেই আমাদের আকৃষ্ট করে। ঘরোয়া সংস্কার ছুঁড়ে ফেলে গিভ অ্যান্ড টেক-এর দিকে এগুচ্ছি। এক নিঃসার জীবনযাত্রা যার শেষ নিতান্ত হতাশাময়। এইভাবে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রায় আমরা ইচ্ছা বা অনিচ্ছার সঙ্গে ভেসে চলেছি। শ্রীশ্রীমার জীবনের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই একজন সামান্যা পল্লীবালা থেকে মা সারদার উত্তরণ জগজ্জননীরূপে।

স্বামী প্রেমানন্দ একদিন ভক্তদের বলেছিলেন, 'তোমরা দেখেই তো এলে, রাজরাজেশ্বরী মা কেমন সাধ করে কাঙ্গালিনী সেজে ঘর নিকুচ্ছেন, বাসন মাজছেন, চাল ঝাড়ছেন, ভক্তের এঁটো পর্যন্ত পরিষ্কার করছেন। তিনি অত কষ্ট করছেন গৃহীদের গার্হস্থ্য ধর্ম শেখাবার জন্য। কী অসীম ধৈর্য, অপরিসীম করুণা, আর সম্পূর্ণ অভিমানরাহিত্য!' পরবর্তীকালে বয়স এবং শরীরের কারণে রান্না, পরিবেশন করতে পারতেন না, কিন্তু সন্তানদের সর্বদা নিজের সামনে বসে খাওয়াতেন। তাদের আসন, থালা, জল, ভাত, ডাল, পোস্ত, তরকারি, সবদিকে ছিল তাঁর আন্তরিক নজর। আবার মাতৃত্বের এক অপূর্ব মূর্তির প্রকাশ দেখতে পাই আমরা।

শ্রীমায়ের সাংসারিক বুদ্ধি ছিল প্রখর। সস্তার সময়ে তিনি চাল, ডাল, গুড় বেশি করে কিনে রাখতেন। বর্ষার আগে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ, ঘর-দরজা মেরামত, গোবর দিয়ে ঘুঁটে বানানো এগুলি ছিল তাঁর নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ। পার্শেলের কাগজ, প্যাকেটগুলিকে না ফেলে গুছিয়ে রাখতেন এবং প্রয়োজনানুসারে পুনরায় ব্যবহার করতেন। আজ আমরা reduce, recycling, re-use-এর যে স্লোগান দিচ্ছি, সেগুলি মা নিজে করে দেখিয়েছেন। আখের খোসা না ফেলে সেগুলি শুকিয়ে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করতেন বলে গোলাপ-মা'র ওপর প্রসন্ন ছিলেন তিনি। এই ঘটনাগুলি মা'র শুধুমাত্র সঞ্চয় প্রবৃত্তি নয় এগুলি তাঁর লোকশিক্ষা।

অপচয় তাঁর অপছন্দ। ফল বিতরণের পর ভক্তের দেওয়া ফলের চুপড়িটি সবাই ফেলতে উদ্যত হলে তিনি অপচয়ের নিন্দা করে চুপড়িটি আনিয়ে নিলেন নিজের কাছে পুনরায় ব্যবহারের জন্য। আজ আমরা নানান প্যাকেটে জিনিস কিনি বা পাই। ওগুলি সযত্নে রেখে পুনরায় ব্যবহার করলে অপচয় হলো না, উৎপাদন কম হলো, প্রকৃতির দূষণও কমল। কী অসামান্য দূরদর্শিতা ছিল মায়ের! কত সামান্য ছোট ছোট কাজের মধ্য দিয়ে জগৎশিক্ষা দিয়েছেন জগন্মাতা।

এই মহিয়সী সাধিকা সংসারলীলা করেছেন লোকশিক্ষার জন্য— 'যার যেটি প্রাপ্য সেটি তাকে দিতে হয়, যা মানুষে খায় তা গোরুকে দিতে নেই; যা গোরুতে খায় তা কুকুরকে দিতে নেই; গোরু ও কুকুরে না খেলে পুকুরে ফেললে মাছে খায়— তবু নষ্ট করতে নেই।'

মা'র অপর এক রূপ দেখে আমরা বিভোর হয়ে যাই! জগৎ-সংসারে কারো সঙ্গে যেন ভেদভাব না থাকে সেজন্য তাঁর আকুল প্রার্থনা— 'চাঁদেও কলঙ্ক আছে, আমার মনে যেন কোনো দাগ না থাকে।' মায়ের ইষ্টদেবী ছিলেন জগদ্ধাত্রী। তাঁর পূজা-অর্চনা ছিল মায়ের নিত্যকর্ম। তিনি দৈনিক লক্ষ জপ করতেন। এই জপ সবসময় পূজার আসনে বসে সম্ভব ছিল না, সেজন্য সংসারের নিত্যকর্মের মধ্যে চলত তাঁর জপ-তপ। মা শিখিয়েছেন সংসার- ধর্মকে পূজার মত গ্রহণ করতে।

মাকে সাধনা করতে হয়েছে সংসারের পঙ্কিলভূমিতে, যাবতীয় প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকে এবং সমস্ত দায়-দায়িত্ব পালন করে। তাঁর সাধনা ছিল একান্তে, তাঁর অন্তরের গহ্বরে।

সন্তানদের প্রয়োজনে অর্থের হিসাব করেছেন, কিন্তু তা অর্থের প্রতি তীব্র অনাসক্তির সঙ্গে। অর্থ-সম্পদ কোনোদিনই মায়ের হৃদয় স্পর্শ করতে পারেনি। নিজে সামান্য বস্ত্রে জীবনধারণ করেছেন, ছিঁড়ে গেলে তা সেলাই করে নিয়েছেন আর ভক্তদের দেওয়া নতুন বস্ত্র অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন গরিব-দুঃখীদের। ভক্তরা ফল-মিষ্টি মাকে দিলে মা তা ঠাকুরকে নিবেদন করে নিজে যৎসামান্য নিয়ে সাবইকে তার প্রসাদ দিতেন। একবার ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মাকে দামি শাড়ি দিলে মা নিতে রাজি হলেন না। বললেন, দিতে হলে যেন একখণ্ড জমি দান করুন--- এতে সাধুভক্তদের সেবা হবে। সন্তানের মঙ্গলের জন্য সদা-তৎপর ছিলেন মা। সংসারে থেকেও তিনি সন্ন্যাসিনী। অনাড়ম্বর ছিল তাঁর জীবনযাত্রা। উদ্বৃত্ত ভাত অপচয় না করে পান্তাভাত খেয়েছেন লোকশিক্ষার্থে।

আমরা, আজকের মহিলারা শুধুমাত্র গৃহবধূ তকমায় অতৃপ্তিতে ভুগি। কর্মরতা মহিলাদের স্থান আমাদের সমাজে নিঃসন্দেহে গৃহবধূর থেকে উঁচুতে। আমরা গৃহবধূরা ইংরাজি হোম-ওয়ার্ক শব্দটিতে আত্মতৃপ্তি বোধ করি। আজকের আমাদের এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা থেকে দৃপ্তভাবে কর্তব্যপরায়ণ হবার অনুপ্রেরণা পাই মা'র জীবন থেকে। তাঁর আশীর্বাণী একটুও যদি হৃদয়ে গ্রহণ করে জীবনে প্রয়োগ করতে পারি, তবে আমাদের মতো ভাগ্যবতী আর আর কে আছে এই পৃথিবীতে? ■

অভদ্র প্রতিবেশী থাকলে চিরাচরিত প্রথার বাইরে গিয়েই সমাধান খুঁজতে হয়

অতিথি কলম

চেতন ভগত

ভারতে নিঃশর্ত বালুচ সমর্থনের ফলে পাকিস্তান পথে আসতে বাধ্য হবে। সে যুক্তির কথায় কান দেবে। বুঝতে বাধ্য হবে যে অন্য একটি দেশের অভ্যন্তরীণ গণ্ডগোলের ক্ষেত্রে অন্য কোনো দেশের নাক গলাবার বা প্ররোচনা দেবার অধিকার কখনই নেই। শান্তি বজায় থাকলে তবেই কেবল উন্নতির পথ খুলবে।

মনে করুন আপনি কলোনির মধ্যে থাকা প্রায় একই ধরনের ছোটখাটো কোনো বাড়ির মধ্যে বাস করেন। আপনার কিছুটা বড়সড় পরিবারকে সামাল দিতে আপনি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিন গুজরান করছেন। পরিবারের সকলের মতামত নিয়ে চলে আপনি সংসারের মধ্যে মোটামুটি শান্তি বজায় রেখে চলেছেন। আপনার পরিবারের তরুণ প্রজন্ম জীবনে উন্নতি করতে কঠোর পরিশ্রম করছে। তারা স্বভাবতই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে।

এবার একটু কল্পনা করুন, আপনার নিকটতম প্রতিবেশীর নাম পি কে। যে আপনার গায়ে গায়ে থাকে। এই পি কে কিন্তু তুলনামূলকভাবে গরিব ও স্বল্প শিক্ষিত। পি কে কিন্তু তার বাড়ির অভ্যন্তরে গণতন্ত্র-টন্ত্র কিছু মানে না— একবারে ডাণ্ডার জোরে শাসন চালায়। সে নিজেকে বিন্দুমাত্র বদলাতেও ইচ্ছুক নয়।

এই পি কে এখন দেখছে আপনি উন্নতির সোপানে চড়েছেন। আপনার ভবিষ্যতে আরও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা সে টের পাচ্ছে। কারণ সে এখনই আপনার বাড়ির গ্যারেজে একখানা গাড়ি নজর করেছে। পি কে-র কোনো গাড়ি নেই। এখন আপনার মতো চেষ্টা, পরিশ্রম করে উন্নতি করার কথা সে ভাবতে পারত কিন্তু সে তা না করে অন্য রাস্তা ধরল।

প্রতি রাতে গোপনে সে আপনার গ্যারেজে হানা দিতে লাগল। কোনোদিন চাকার হাওয়া খুলে দিচ্ছে, কোনোদিন গাড়ির কাঁচ ভেঙে দিয়ে যাচ্ছে, আবার কোনোদিন বা গাড়ির ওপর গভীর আঁচড় কেটে দিয়ে যাচ্ছে। রাতারাতি এই কাণ্ড করে সে সরে পড়ে। বাড়ি গিয়ে তার একমাত্র আনন্দ কেবল টিভি দেখা, সে অলসভাবে বসে পড়ে।

এদিকে আপনি যেহেতু আপনার মহল্লা ও সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন শান্তিপ্রিয় ও সম্মানীয় ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত, আপনি যথাসম্ভব ভদ্রভাবেই, তাই এই উপদ্রবের সমাধান করার চেষ্টা করেন। প্রথমেই আপনি তাকে এমনটা না করার অনুরোধ জানান। যথারীতি সে এতে কর্ণপাত করে না। এরপর আপনি বেশ কয়েকবার তাকে বাড়িতে চায়ে নেমন্তন্ন করেন। সে খুব মস্তি করেই আপনার সুস্বাদু চা খায়। আপনার সঙ্গে করমর্দন করে চলে গিয়েই যথাপূর্বং নিজের কুকর্ম চালু করে দেয়। আপনি এর পরও তার জন্মদিন উপলক্ষে তার বাড়িতে গিয়ে ফুলের তোড়া উপহার দিয়ে আসেন। সে আপনার উপহার গ্রহণ করে কিন্তু পরের দিনই আপনার গাড়িগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে ভোলেনা। শান্তিপ্রিয় সুভদ্র মানুষ হিসেবে আপনি কলোনি কমিটির সদস্য ও পদাধিকারীদের সাধারণ সভায় বিষয়টি তুললে তারা আপনাকে অস্থির না হয়ে শান্তি বজায় রেখে চলার উপদেশ দেয়। অবশ্য তারা পি কে-কেও একই কথা বললে সে এসবে কান দেয় না। কিছু শোনেও না। উল্টে সে আপনাকে ও আপনার পরিবারকে ভয় দেখাতে আপনার বাড়িতে গুণ্ডা পাঠায়।

এর পরেও আপনার পরিবারের মধ্যে থাকা নিজ আরোপিত তকমায় ভূষিত কিছু বিশেষজ্ঞ ও 'ধর্মনিরপেক্ষ নিষ্ক্রিয়তাবাদী' আপনাকে পি কে-র সঙ্গে আরও আলোচনা চালিয়ে যেতে বলে। আশ্চর্যের কথা, বিশেষজ্ঞদের দেওয়া সমাধানসূত্র যদি বা কখনও তারা দেয় তার মধ্যে থাকে— (১) কত টাকার ক্ষতি হয়েছে— গাড়িগুলোর খুব কি বেশি? (২) গাড়িগুলোকে ভাল করে ঢাকা দিয়ে রাখলে ভাল হবে। (৩) কী দরকার, গাড়িগুলো তো বেচে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। এমন সব নিরাশা ও ক্লীবত্বের পথে চলার রাস্তাই তারা অনুমোদন করে।

আর ঠিক এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে যদি কেউ একটু অচেনা পুরুষালি সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করে— বিশেষজ্ঞরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে গাল পাড়তে শুরু করে। এই মহামান্য বিশেষজ্ঞরা এমন পর্যন্ত বলতে দ্বিধা করে না যে এসব তো তোমারই দোষ, গাড়ি কিনতে গেলে কেন? তুমি যখন ফুল পাঠিয়েছিলে তখন আরও বেশি করে পাঠাওনি কেন? আচ্ছা তুমি ওকে একখানা গাড়ি দিয়ে দিচ্ছ না কেন?

পি কে কিন্তু তার কুকর্ম জারি রেখেছে। এখন আপনি কী করবেন? এখন বলি, যদি আপনার এখনও এই সাংকেতিক ঘটনাগুলিকে সনাক্ত করতে অসুবিধে হয় তা হলো কাশ্মীর সমস্যা। আপনি হলেন ভারত, পি কে হলো পাকিস্তান আর উল্লেখিত কলোনি কমিটি হলো রাষ্ট্রসঙ্ঘ বা ইউ এন ও। এই সমস্যা আজ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সূত্রপাত হয়েছিল স্বাধীনতার পরেই। নেতার পর নেতা, বিশারদের পর বিশারদ, চিন্তাবিদের পর চিন্তাবিদ কেউ কোনো কিনারা করতে পারেনি। কাশ্মীরি তরুণরা দুর্দশার মধ্যে দীর্ঘকালীন বসবাসে হতাশ। তারা আশঙ্কার মধ্যে দিন কাটায়, কেননা তাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এই পরিস্থিতিতে অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্যে কাজ করে চলেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। তারা একবার সাধারণ নাগরিকদের সুরক্ষা দেবার চেষ্টা করছে, পরক্ষণেই আবার ঝাঁপিয়ে পড়তে হচ্ছে উগ্রবাদীদের হামলা ঠেকাতে। হায়! এই কাজে বিন্দুমাত্র ভুল ত্রুটি হলেই তাদের চূড়ান্ত দুর্নাম করা হচ্ছে অথচ এই উভয়সঙ্কটের মধ্যে কিছু ভুল ভ্রান্তি যে কোনো মানুষের ক্ষেত্রেই ঘটে যেতে পারে। আমাদের দেশ এই কাশ্মীরকে নিরাপদ রাখতে, শান্তি বজায় রাখতে বছরের পর বছর হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে চলেছে। যে টাকায় কাশ্মীরে বহু সম্পদ সৃষ্টির সম্ভাবনার সঙ্গে তরুণদের স্বপ্ন সফল হওয়ার সুযোগ থাকতে পারত! আর সত্যি সত্যিই এই স্বাধীনতা দিবসের দিন আপনি একটা নতুন সমাধান সূত্রের পরীক্ষা করলেন। আপনি সরাসরি গিয়ে পি কে-র প্রিয় কেবল লাইনের সেট টপবক্সের তার ছিঁড়ে দিলেন। চূড়ান্ত হতাশা হয়ে পি কে যতবার বক্স মেরামত করার চেষ্টা করল আপনি ততবার তার ছিঁড়ে দিতে লাগলেন। হতবুদ্ধি পি কে কী যে করবে কিছু ঠিক করতে পারল না। এরপর আপনি পি কে-কে আলোচনায় বসতে বললেন। এবার কিন্তু পি কে শুড়শুড় করে রাজি হলো।

ওপরের ঘটনাটা কাল্পনিক হলেও ঠিক এই পন্থাই স্বাধীনতা দিবসের দিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর বক্তব্যে অনুসরণ করেছেন। বালুচিস্তানে জারি থাকা পাক-বিরোধী বিক্ষোভকারীদের তিনি প্রত্যক্ষ সমর্থন করে ভারতকে তাদের পাশে দাঁড় করালেন। এখানে বালুচিস্তানের বিক্ষোভ সম্পর্কে আমাদের নিজেদের স্বার্থেই কিছুটা ওয়াকিবহাল থাকা দরকার। কেন আমরা এই আন্দোলনকে সমর্থন করছি আর কেনই বা এই সূত্রে আমাদের সরকারের পাশে দাঁড়ানো দরকার সেটা নিরীক্ষণের দাবি রাখে। আমাদের এই নিঃশর্ত বালুচ সমর্থনের ফলে পাকিস্তান পথে আসতে বাধ্য হবে। সে যুক্তির কথায় কান দেবে। সে বুঝতে বাধ্য হবে যে অন্য একটি দেশের অভ্যন্তরীণ গণ্ডগোলের ক্ষেত্রে অন্য কোনো দেশের নাক গলাবার বা প্ররোচনা দেবার অধিকার কখনই নেই। আর শান্তি বজায় থাকলে তবেই কেবল উন্নতির পথ খুলবে।

প্রসঙ্গত ভূখণ্ড হিসেবে বালুচিস্তান পাকিস্তানের থেকে অর্ধেক মাপের, কিন্তু জনসংখ্যার মাত্র চার শতাংশ পাকিস্তানি। পরিপ্রেক্ষিত ও ইতিহাস ভিন্ন ধরনের হলেও ঠিক কাশ্মীরের মতোই বালুচরাও মনে করে স্বাধীনতার সময় তারাও একটি স্বাধীন দেশের মর্যাদা পেতে পারত যা তারা পায়নি। পাকিস্তানি সেনা তাদের ওপর ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করছে না, উল্টে নির্যাতন চালাচ্ছে। বালুচরা তাই পূর্ণ স্বাধীন দেশ হতে চায়। ভুলে গেলে চলবে না বালুচ বিক্ষোভ সত্যাগ্রহ ছিল না— এটি একটি হিংসাদীর্ণ আন্দোলন আর পাকিস্তান এই আন্দোলনকারীদের সন্ত্রাসবাদী তকমা দিয়েছে। সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে দেশ বন্দুকের নলের মাধ্যমে শাসন চালায় সেখানে শাসকের বিরোধীপক্ষকে তো স্বাভাবিক নিয়মেই সহিংস হতে হবে।

এখানে ভারতকে খুব সূক্ষ্ম রাজনৈতিক কৌশলে চলতে হবে। কোনোভাবেই নিরপরাধ নাগরিকদের ওপর আক্রমণকারীদের অর্থনৈতিক সাহায্য বা সরাসরি সমবেদনা জানানোর জালে পা দিলে হবে না। আমাদের বালুচদের জন্য সমর্থন একান্তই কূটনৈতিক কৌশলগত যাতে পাকিস্তান কাশ্মীরে নাক গলানো থেকে বিরত থাকে। আর এরই বাড়তি ফল হিসেবে পাকিস্তান যদি বালুচিস্তানে নির্যাতন বন্ধ করে তার থেকে ভাল তো কিছুই হয় না।

ভারত আন্তর্জাতিক পরিসরে বালুচদের দুর্দশার কথা তুলে ধরে তাদের প্রতিবাদ আন্দোলনকে বিশ্বব্যাপী মান্যতা দেওয়ার প্রয়াস করতেই পারে। তারা এই মর্মে পাকিস্তান বিরোধী জন-সচেতনা বাড়ানোর জন্য প্রচারও শুরু করতে পারে। বালুচরা স্বাধীনতা অর্জন করলে (যদি ধরা যায়) সেক্ষেত্রে পাকিস্তানের অনেক কিছুই হারাবার আছে। সে আরও ক্ষুদ্র হয়ে পড়বে। সেই হিসেবে কাশ্মীরের (যা ভারত কোনোদিনই ছাড়বে না) ক্ষেত্রে ভারতের ক্ষতি অনেক কম। বালুচিস্তান বেরিয়ে গেলে পাকিস্তান মাপে অর্ধেকতো হবেই ক্ষমতাতেও অনেক দুর্বল হয়ে পড়বে। অত্যন্ত চিন্তার কথা যদি বিশ্বব্যাপী এমন একটা মতৈক্য দেখা যায়--- (১) হ্যাঁ, বালুচিস্তানে যথাযথই মানবাধিকার লঙ্ঘনের বড় সড় সমস্যা চলছে। (২) পাকিস্তান একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র যে কারণে তাকে খণ্ডিত করে শক্তি খর্ব করলে তবেই আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ নির্মূল হবে। সেক্ষেত্রে পাকিস্তানের টুকরো হয়ে যাওয়া কেউ ঠেকাতে পারবে না।

তাই পাকিস্তানের নিজের স্বার্থেই আলোচনার মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যার হাল ফেরানো উচিত। এই মধ্যবর্তী সময়ে আমরা কিন্তু বালুচদের নৈতিক, মৌখিক সমর্থন জুগিয়ে যাব। কিন্তু যে প্রয়াসের মধ্যে অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা ও সুচিন্তিত মাত্রা থাকবে। ■

বিশেষ প্রতিবেদন

অভ্যন্তরীণ জলপথকে সুপরিকল্পিতভাবে কাজে লাগাতে চায় মোদী সরকার

দিব্যজ্যোতি চৌধুরী

বারাণসী রাজঘাটে দুটি বড়মাপের সওদাগরি জাহাজকে গাঁদার মালা ও বেলুন দিয়ে সাজানো হয়েছে। বিশাল তাঁবুর নীচে সরকারি কর্মকর্তারা শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিয়ে ছোটাছুটি করছেন; কেন্দ্রীয় জাহাজমন্ত্রী নীতীন গড়কড়ি এসে পড়লেন বলে। জাহাজ দেখতে ভিড় জমেছে ভালই। ঠাসাঠাসি ভিড়ের মধ্যে একজনের ঘাড়ের উপর দিয়ে আরেকজন উঁকি মারছে। ঘটনাস্থল থেকে মেরেকেটে ৫০ মিটারও হবে কিনা সন্দেহ, সেখানে প্রিয়জনের মৃতদেহের উপর কয়েকজন কাঠ চাপাচ্ছে ও বাকিরা নিথর হয়ে দেখছে। আশেপাশে কী ঘটে চলেছে সেদিকে কারও হুঁশ নেই। ওদিকে নীতীনজী এসে পড়লেন— মিনিট খানেকের মধ্যে পতাকা নাড়লেন---ভিড় 'ভারতমাতা কী জয়' ধ্বনিতে ফেটে পড়ল। এদিকে ততক্ষণে চিতায় আগুন লেগে গেছে। ভিড়ের চিৎকারে আগুনে কাঠ পোড়ার শব্দ ঢাকা পড়ে গেল। জাহাজ দুটি ছেড়ে দিল। এটাই বারাণসী! শুরু আর শেষ যেন এখানে পাশাপাশি চলে— হর্ষবিষাদ একই তারে বাঁধা থাকে।

গত ১২ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্বাচন কেন্দ্র বারাণসী থেকে সরকারের স্বপ্নের প্রকল্পের সূচনা হলো। পণ্য পরিবহণের খরচ অনেকটা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরীণ জলপথ দিয়ে বড়মাত্রায় পণ্যপরিবহণ হলো এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। ২৪টা নতুন মারুতি গাড়ি আর ১৪০০ টন মাল নিয়ে এমভি ভি ভি গিরি এবং এম ভি জয় বাসুদেব পাড়ি জমাল। জয় বাসুদেব যাবে উত্তরপ্রদেশের বালিয়ায় এবং ভিভি গিরি জাতীয় জলপথ-১ ধরে ১১০০ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে কলকাতায় পৌঁছবে।

সরকারের জলমার্গ বিকাশ প্রকল্পের আওতায় জলপথ-১ এর উন্নয়নে খরচ ধরা হয়েছে ৪২০০ কোটি টাকা। সারাবছর ধরে গঙ্গার বুকে বড়মাত্রায় পরিবহণ চালু রাখতে প্রথমেই যেটা করতে হবে তা হলো নদীর বুক থেকে পলি তুলে ন্যূনতম নাব্যতা বজায় রাখা। দরকার আধুনিক নদী তথ্যপ্রযুক্তি আর উন্নতমানের ডিজিটাল ব্যবস্থা যা দিয়ে নদীর বুকে জাহাজের অবস্থান সম্পর্কে সবসময় খবরাখবর রাখা যাবে। কিন্তু সেসব এখনও অনেক দূরের ব্যাপার। এতদিন পর্যন্ত দেশের সবচেয়ে বড় জলপথকে কার্যকর ভাবে ব্যবহার করার কথা কোনো সরকার ভাবেনি।

'গিরির' নাবিক লক্ষ্য করেছেন যে, তাঁর জাহাজ যখন বারাণসী থেকে রওনা হলো তখন ছোট ছোট শহর ও গ্রাম সংলগ্ন মন্দির ঘাটগুলির ৫০টার মতো সিঁড়ি চোখে পড়ত। আর এখন ৫-১০টার বেশি দেখা যাচ্ছে না। সপ্তাহ দু'-একের মধ্যে গঙ্গার জলস্তর কমপক্ষে তিন মিটার বেড়েছে। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বর্ষার জল ঢোকায় গঙ্গার জলস্তর ৭ থেকে ১৩ মিটার পর্যন্ত বেড়ে যায়, আবার বর্ষা চলে গেলে কোথাও কোথাও গভীরতা ২ মিটারেরও বেশি নীচে চলে যায়। নিরাপদে যাবার জন্য ভিভি গিরির অন্তত ৩ মিটার গভীর জল চাই। সে কারণে খরার মরশুমে গঙ্গার পলি তোলার প্রয়োজন। ভারতের অভ্যন্তরীণ জলপথ কর্তৃপক্ষের (IWAI) সভাপতির মতে, 'এটা প্রমাণ হলো যে, বর্তমান পরিকাঠামোয় আমরা অন্তত ১৪০০ টন মাল পরিবহণ করতে পারি। পরিকাঠামো উন্নত করতে আমাদের আরোও চেস্টা করতে হবে।' এখন প্রশ্ন হলো, সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে জলস্তর নেমে গেলে জাহাজ মাটিতে ঠেকে যাবে না তো? গিরির নাবিক জানাচ্ছেন যে, কয়েক বছর আগে বিহারের ভাগলপুরের কাছে এরকম একটি জাহাজ আটকে গেছিল। প্রায় এক বছর, যতদিন জাহাজ ফের চালানো যায় ততদিন পর্যন্ত মালিককে জাহাজে নিরাপত্তারক্ষী রাখতে হয়েছিল। সে কারণে প্রথম সফরে ভিভি গিরি এবং জয় বাসুদেবের সঙ্গী হলো ঘাগরা ও সুখদেব। ঘাগরার কাজ হলো জাহাজ দুটির গতিপথের উপর নজর রাখা। সুখদেব হলো একটি শক্তিশালী মোটর বোট। জাহাজ দুটি আটকে গেলে সুখদেব টেনে নিয়ে যাবে। ঘাগরাতে রয়েছে একটি প্রতিধ্বনি যন্ত্র যা জলের গভীরতা মাপবে। একে জিপিএস ব্যবস্থার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সরকার ১.৫ মিটার গভীরতায় চলাচলের উপযুক্ত জাহাজ বানানোর চেষ্টা করছে যেগুলি আগের থেকে চওড়াও হবে। নিরাপদে কলকাতায় মারুতি পাঠানোর জন্য IWAI আন্তর্জাতিক জলপথ-সহ কমপক্ষে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন নাবিক ভাড়া করেছে। যতদিন পর্যন্ত নাব্যতা ন্যূনতম ৩ মিটার করা সম্ভব হচ্ছে ততদিন, এছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। ৫২ বছরের নাবিক মোতিলাল চৌধুরীর গঙ্গার বুকে ২৮ বছর ধরে জাহাজ চালানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে। জলের গতি আর ঢেউ দেখে তিনি অনায়াসে বলে দিতে পারেন কোথায় কত জল রয়েছে। যেমন বারাণসী থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে তিনি দেখতে পান যে একটা বড় জায়গা জুড়ে জোরে জল

বইছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জাহাজ ঘোরান। কারণ ওখানে অল্প জল রয়েছে। অন্য একজায়গায় জলে একটা ঘূর্ণি দেখে তিনি আন্দাজ করেন যে ওখানে একটা গভীর খাত রয়েছে। গতিপথ চিহ্নিত করার জন্য পর্যবেক্ষক জাহাজ থাকলেও তাঁদের কাছে নিজস্ব একটা মানচিত্র রয়েছে। কারণ উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে গঙ্গার গভীরতা নিয়ে ভরসা করা যায় না। নীচে চোরাবালির স্তর থাকায় সেখানে সবসময় গভীরতার হেরফের হয়। মাস দুয়েক আগেও যেখানে বাঁদিকের তীর ঘেঁষে জাহাজ চলত সেখানে এখন ডানদিক দিয়ে চলতে হচ্ছে। এছাড়া বর্ষার মরশুমে এইপথে জাহাজ মাঝে মধ্যেই প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির কবলে পড়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এসব কারণে এলাহাবাদ থেকে হলদিয়া পর্যন্ত ১৬০০ কিলোমিটার বিস্তৃত ভারতের প্রথম এবং দীর্ঘতম 'জাতীয় জলপথ-১' ১৯৮৬ সালে নথিবদ্ধ হলেও এখন খুব একটা ব্যবহার করা হয় না। ব্যতিক্রম শুধু ফরাক্কা থেকে হলদিয়া পর্যন্ত পথ। এই পথে এখনও নিয়মিত কয়লা পরিবহণ হয়।

উপযুক্ত দেশীয় বন্দরের অভাবে পণ্য ওঠা-নামা যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। অস্থায়ী অবতরণের প্রয়োজনে জাহাজপিছু ৫ লক্ষ টাকারও বেশি খরচ হয়। এরকম খরচ পোষানোর জন্য ঠিকাদারকে যথেষ্ট পরিমাণ ব্যবসা জোগাড় করতে হয়। এছাড়া বিকল্প উপায় হলো নৌকায় করে জাহাজে মাল ওঠানো-নামানো। এতেও প্রচুর শ্রমিক লাগে যাতে খরচ বেড়ে লাভ কমে যায়। নদীর উপর বিভিন্ন জায়গায় ব্রিজগুলি আরেকটা সমস্যা। সেগুলির তলা দিয়ে যাতে পণ্যবাহী জাহাজ যাতায়াত করতে পারে সেটাও IWAI-কে মাথায় রাখতে হচ্ছে। নাব্যতার হেরফেরে সন্ধ্যার পর জাহাজ চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে নদীর ধারে মন্দির সংলগ্ন এলাকায় যেখানে যথেষ্ট আলো রয়েছে এমন জায়গায় জাহাজ নোঙর করতে হয়।

এই যাত্রাপথে অনেক দর্শনীয় স্থানও রয়েছে। সে কারণে এপথে পর্যটনযাত্রা বাড়ানোর ইচ্ছা সরকারের রয়েছে। বর্তমানে বিশেষত বর্ষার সময় বিদেশি দর্শক নিয়ে চারটি পর্যটনতরী এইপথে চলাচল করে।

এখন যেটা জরুরি তা হলো সুন্দর রক্ষণাবেক্ষণযুক্ত একটি স্থায়ী ও সুনির্দিষ্ট যাত্রাপথ। যেমন কেরলের কিছু জলপথে আলোকযুক্ত বয়া বা পিলার বসিয়ে পথ চিহ্নিত করার ব্যবস্থা রয়েছে, সেরকমটি এখানেও প্রয়োজন। বৈদ্যুতিন ম্যাপ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ GPS ব্যবস্থার মাধ্যমে যাতে জাহাজ তার যাত্রাপথ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও নাব্যতা জানতে পারে তার জন্য IWAI চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে এলাহাবাদ থেকে পাটনা পর্যন্ত দেড় মিটার, পাটনা থেকে বাঢ় পর্যন্ত দুমিটার এবং বাঢ় থেকে কলকাতা পর্যন্ত আড়াই মিটার ন্যূনতম নাব্যতা বজায় রাখতেই হয়। ন্যূনতম নাব্যতা ৩ মিটার করার ব্যাপারে সরকার কিন্তু যথেষ্ট আশাবাদী। বিহারের কাছে কর্মশালা নদী গঙ্গায় মেশাতে এখানে গঙ্গা তার পূর্ণরূপ ধারণ করে। চওড়াও বেড়ে ৪-৫ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়। আবার পাটনার আগে সারণ জেলার দরিগঞ্জে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর মতো কেব্‌ল্ ব্রিজ তৈরির কাজ চলছে। নদীর বামচরে অন্তত দুশো নৌকা আর তার পেছনে লরি পুরো রাস্তাটা আটকে রেখেছে। স্বভাবতই জায়গাটা যথেষ্ট বিপজ্জনক। এখানে বালির রমরমা কারবার। সোন নদী থেকে বালি তুলে নৌকাগুলি দরিগঞ্জের চরে এসে খালাস করে। তারপর লরিগুলি ভর্তি হয়ে বিহার বা অন্যত্র রওনা হয়। এই একটা জায়গায় সরকারকে অবিলম্বে নজর দিতে হবে। এরকম আরও অসংখ্য অপ্রত্যাশিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই সরকার ভারতের এই দীর্ঘতম ও প্রাচীনতম জলপথকে সুপরিকল্পিত উপায়ে বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবহার করতে চায়।

এক নজরে জলমার্গ বিকাশ প্রকল্প

 ভারতের নথিভুক্ত অন্তর্দেশীয় জলপথের সংখ্যা ১১১। এর মধ্যে আংশিক বা পুরোদমে চালু রয়েছে ৫টি জলপথ। 'জাতীয় জলপথ-এক'-কে ব্যবহারযোগ্য করতে খরচ হবে আনুমানিক ৪২০০ কোটি টাকা। বিশ্বব্যাঙ্ক আংশিক অর্থ জোগান দেবে।

জলপথের সুবিধা

 জলপথে পরিবহণের খরচ প্রতি কিলোমিটারে টনপ্রতি ৩০ থেকে ৫০ পয়সা যেখানে রেলপথে খরচ ১ টাকা এবং সড়কপথে ১.৫ টাকা।

 IWAI কর্মকর্তারা লক্ষ্য করেছেন সড়কপথে একটা সাধারণ ট্রেলার ৬টা গাড়ি বহন করতে পারে যেখানে একটা ডবলডেকার পণ্যতরী ৩০০টার মতো বহন করতে পারে অর্থাৎ একটা জাহাজ ৫০টা ট্রেলারের সমান মাল বইতে পারে।

 জলপথ পর্যটনের জন্য যথেষ্ট সম্ভাবনাময়।

 এটি একটি পরিবেশ বান্ধব পরিবহণ ব্যবস্থা।

সম্ভাবনা

 ভারতের মোট বাণিজ্যের ৩.৫ শতাংশ জলপথে হয় যেখানে চীনে ৪৭ শতাংশ, জাপানে ৪৪ শতাংশ, এমনকী বাংলাদেশেও ৩৫ শতাংশ হয়ে থাকে।

 সরকার জলপথে পণ্য পরিবহণ ২০১৮ সালের মধ্যে বাড়িয়ে ৭ শতাংশ করতে চায়।

সরকারি সদর্থক পদক্ষেপ

 আগামী দিনে যেসব অন্তর্দেশীয় জলপথও বন্দর তৈরি করা হবে সেগুলি যাতে দেশের সড়ক ও রেলপথের সঙ্গে যুক্ত করা যায় এমন একটি বহুমুখী টার্মিনালের সম্প্রতি শিলান্যাস করেছেন কেন্দ্রীয় পরিবহণ মন্ত্রী নীতীন গড়করি।

 আগে দেশে ৫টি নথিভুক্ত অন্তর্দেশীয় জলপথ ছিল। এবছর সরকার আরও ১০৬টি জলপথকে নথিবদ্ধ করেছে। দেশের ১৪,৫০০ কিলোমিটার জলপথে সংগঠিত উপায়ে পণ্য পরিবহণ সুনিশ্চিত করতে আপাতত পরীক্ষামূলক ভাবে গোয়া, পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও কেরলে এই প্রকল্প চালু করা হলো।

 নতুন জলপথ সম্বলিত জাতীয় জলপথ বিল সংসদে পাশ করানো হয়েছে।

 গড়করি জানিয়েছেন, ভারতে পণ্য জোগান দেবার খরচ খুব বেশি— প্রায় ১৮ শতাংশ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে একজন শিল্পপতি অভিযোগ করেছেন দিল্লী থেকে মুম্বইতে মাল পাঠাতে যা খরচা হয় তার থেকে কম খরচে দিল্লী থেকে লন্ডনে মাল পাঠানো যায়। ■

গুরু পরম ব্রহ্ম

শেখর সেনগুপ্ত

সদগুরুর নিকট দীক্ষালাভ যে একটি প্রকৃত পুণ্যকৃত্য সম্পন্ন করা, এ কথা আমাকে প্রায়শ স্মরণ করিয়ে দিতেন প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাঃ বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত। কলকাতার বাগুইআটি এলাকায় নির্মিত ডাক্তারবাবুর নিবাস 'ফয়রাভবন'-এ কালেভদ্রে পা রেখেছি। খুব ব্যস্ত মানুষ। দু'বেলা যথাবিহিত যত্নসহকারে রোগী দেখেন এবং তাঁর চিকিৎসার মহিমা তখন প্রচারিত লোকের মুখে মুখে। ব্যক্তিগত আলোচনায় যাবার মতন অবকাশ তাঁর ছিল না বললেই চলে। তবুও সবদিকের সাযুজ্য রেখে কথার আদান-প্রদানে তিনি ছিলেন বেশ ভদ্র ও শান্ত। আমাকে একদিন বললেন, 'অফিস আর লেখালেখি নিয়ে খুব তো ফাটাফাটি করছেন। এরপর বয়স যখন বাড়বে, শরীর যদি অশক্ত নাও হয়ে পড়ে, মনে কিন্তু শূন্যতা ও শৈথিল্যভাব আসবেই।'

'আপনি তো আছেন। এক ছুটে চলে আসব।'

'আর আমি যদি তখন এই দুনিয়ায় আর না থাকি? আপনাকে তখন নির্ভর করতে হবে ঈশ্বার করুণার ওপর। আর সেই উপায়টা বাতলে দিতে পারেন কেবল একজন সদগুরু। নিষ্ঠাবান হিন্দু পরিবারের সন্তান, আর দেরি না করে উপযুক্ত গুরু খুঁজে নিন।'

ডাক্তার সেনগুপ্ত স্বল্পভাষী হয়েও অতগুলি কথা একটানা বলে গেলেন। সেই সন্ধ্যায় তিনিই আমাকে পরামর্শ দেন, সস্ত্রীক ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে গিয়ে দীক্ষা নিতে। কথাটা আমাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এরপর যখনই কোনো কাজে বিঘ্ন বা ত্রুটিবিচ্যুতি ধরা পড়েছে, আমি একজন গুরুর অভাব অনুভব করেছি। আমার বাবা ও মা অবশ্য ছিলেন ভোলাগিরির আশ্রমে আশ্রিত। তাঁরা যেদিন দীক্ষা নেন, আমি তখন নেহাৎ শিশু। অথচ সেই দিব্যানুষ্ঠানের ছবিটি মনের পর্দায় গেঁথে আছে বয়স সত্তরের গণ্ডী অতিক্রম করবার পরও।

যাইহোক, ডাক্তারবাবুর পরামর্শ আমার স্ত্রী দীপ্তির কানে পৌঁছতেই সে ক্রমাগত আমাকে তাগাদা দিতে থাকে। তার মতে, দীক্ষা গ্রহণে আর বিলম্ব ঘটলে আমাদের সাংসারিক জীবনে ঘনিয়ে আসতে পারে অপ্রত্যাশিত ক্লেশ ও বিকার। অবশেষে ১৯৯১ সালের মাঘীপূর্ণিমার দিন আমরা দু'জনে অনাড়ম্বর আয়োজনের মধ্য দিয়ে শৈবমতে দীক্ষিত হলাম ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মূল কার্যালয়ে।

দীক্ষা যিনি দিলেন, তিনি স্বয়ং ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখ্য কর্ণধার। স্বামী অরূপানন্দ মহারাজ। তাঁর মতন মাতৃভাবসম্পন্ন সন্ন্যাসীকে গুরু হিসেবে লাভ করাটা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। যখনই মনে কোনো বহুধা কিংবা একরেখিক দুশ্চিন্তার মেঘ এসে ভর করেছে এবং আমি বিচলিত হয়ে উঠেছি, সোজা ছুটে গিয়েছি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয়ে। যেখানে পেয়ে গিয়েছি ঐশীশক্তিতে শক্তিমান গুরুদেবের বলিষ্ঠ সামীপ্য। তাঁর একটা কথা আজও আমার কানে লেকে রয়েছে, 'নিজেকে কোনো অবস্থাতেই সমাজের বাইরে ভাববে না। তোমার পরিচয় যদি ক্ষীণতমও হয়, তাহলেও জানবে, ওই সমাজই তোমাকে যা দেবার, দেবে; অন্য কেউ নয়।'

সংসারে দায়বদ্ধ মানুষ আমি। অফিসের কাজে এক-এক সময় তুলকালাম ছোটাছুটি। তার উপর আবার হরেক কিসিমের লেখা তৈরির বরাত বা তাগিদ। কিন্তু উপার্জন সারাটা জীবন সীমিত রয়ে গেল। পকেট থেকে টাকা উপচে পড়বে,— এটা একেবারে স্বপ্নাতীত। মাসের শেষে টানাটানি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্ত্রী দীপ্তির কড়া হুঁশিয়ারি, 'প্রত্যেক মাসে যতটুকু পারবে, আশ্রমের ফান্ডে দিয়ে আসবে। রিসিভটা আমাকে দেখাবে। কিছুই তো আমরা করতে পারিনি। এখন তবু ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মাধ্যমে সামান্য কিছু করবার সুযোগটা পাচ্ছি। সর্বজ্ঞ গুরুদেব ঠিক খবর রাখতেন। বলতেন, 'এটাই হলো সনাতন ধর্মের আসল কথা। তোমার যা আছে, তার কিছুটা ভাগ অন্যদেরও দিতে হয়। খালি আমার আমার ভাব যেন না থাকে।'

অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ মানুষ তিনি। যখন আমার মাথার ওপর হাত রেখেছেন, সারা শরীর জুড়িয়ে গিয়েছে। তিনি ঠিক যেন

ছিলেন আমার মায়ের মতন। একদিন গুরুদেবের পায়ের কাছে বসে আছি। তাঁর দেওয়া একটি পাকা আম চুষে চুষে খাচ্ছি। হঠাৎ গুরুদেব প্রশ্ন করলেন, 'তুমি খুব পেটুক। তাই না?'

মাথা নেড়ে বললাম, 'একদম ঠিক কথা।'

তখনই রামনারায়ণ তর্করত্নের লেখা 'কুলীন কুল সর্বস্ব' নাটক থেকে গুরুদেব বিলক্ষণ উদ্ধৃতি টানলেন :

'ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি দু'চারি আদার কুচি
কচুরি তাহাতে খান দুই।
ছকা আর শাকভাজা মতিচুর বুঁদে খাজা
ফলারের জোগাড় বড়ই।'

সেবার বালীগঞ্জের আশ্রমে খুব হুলস্থূল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীজী আসছেন আমার গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। ক'দিন ধরে সাজ সাজ রব। আমি আব্দার করি, 'গুরুদেব, আমি কিন্তু আসব।'

গুরুদেব বললেন, 'তোমার আসা হবে না।'

আমার ব্যাকুল প্রশ্ন, 'কেন, গুরুদেব?'

উত্তর সংক্ষিপ্ত, 'অফিস তোমাকে গিলবে।'

ঋষিবাক্য সদাই ধ্রুব। সত্যি আমি যেতে পারিনি। শেষ মুহূর্তে অফিস আমাকে ঠেলে পাঠায় দুর্গাপুর স্টাফ ট্রেনিং সেন্টারে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস নিতে। আমি গল্প-টল্প লিখি জানবার পর গুরুদেব বলেছিলেন, 'কল্পনা যেন অশ্বমেধের ঘোড়া না হয়। নিজের চারপাশে যা দেখবে, তাদের নিয়েই লিখবে। আমিও কলম ধরেছি। প্রাণের ঠাকুরের সঙ্গ করেছি অনেক বছর। সেই স্মৃতি নিয়ে আমার একখানা বইও আছে।'

'আমি পড়বো।'

'পড়ো।'

সেই দিনই আমার সংগ্রহে এসে গেল সেই অসাধারণ স্মৃতিকথা 'প্রাণরাম শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবমধুর লীলা প্রসঙ্গ'। যুগাচার্য শ্রীশ্রী প্রণবানন্দজী মহারাজকে হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য ওই স্মৃতিচিত্রণ পাঠ অত্যাবশ্যক। গ্রন্থের ভূমিকায় স্বামী নির্মলানন্দ লিখেছেন, '...শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী অরূপানন্দজী সদর্থেই একজন ভাবের মানুষ।... তিনি যেন মাতৃঅঙ্গে এক সরল শিশু।... এই বৃদ্ধ বয়সেও শ্রীগুরুর প্রসঙ্গ বলিতে বলিতে তাঁহার দুইটি চক্ষু বাহিয়া প্রেমাশ্রুধারা গড়াইয়া পড়ে...'।

আমি ভাগ্যবান। তাই আমি একজন গুরুকে পেয়েছি। আবার আমি ভাগ্যহীনও। তাই গুরুর মহাপ্রয়াণবার্তা পাই আমি তিন দিন অতিবাহিত হবার পর— যখন আমি সেই অফিসেরই কাজে হায়দরাবাদের স্টাফ কলেজে রয়েছি। দু'চার খানা বাংলা পত্রিকা আসে। তবে হাতে আসতে আসতে কয়েকদিন কেটে যায়। বাসি খবর হাতড়াই। হাহাশ্বাসে নিজের বুকে কিল মারি। ■

১৯৪৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

প্রতি সংখ্যা ১০্ টাকা

স্বস্তিকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০্টাকা

অবহিত হবার এবং অবগত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম

—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

২৭/১বি, বিধান সরণি, কোলকাতা-৭০০০০৬

দূরভাষ (০৩৩) ২২৪১০৬০৩, ২২৪১৫৯১৫

অন্য রকম

গোঁড়ামির শিকল খুলে স্বপ্নের উড়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ উইন্ড স্ক্রীনের ওপারে টুকরো টুকরো মেঘের ফাঁকে নীল আকাশ। পিছু হটা বাতাসের ক্রুদ্ধ গর্জন। আর এপারে ককপিটে হাজারও সুইচ প্যানেল হ্যান্ডেলের ভিড়ে চালকের আসনে বসে থাকা এক পঁচিশ ছোঁয়া তরুণী! —ছবিটা এমনিতে অসাধারণ কিছু নয়। বিশেষ করে ভারতীয় পাইলটদের ২০ শতাংশই যেখানে মহিলা। কিন্তু এই তরুণীর নামটি শুনলে পাঠক মুহূর্তের জন্য হলেও আপনি থমকাতে বাধ্য হবেন। সারা হামিদ আহমেদ। মুসলমান কন্যা হয়ে পাইলট!

‘শুরুতে সকলে আমাকে খ্রিস্টান ভাবেন কিন্তু, নামটা শোনার পর যেভাবে ঢোঁক গিলতে শুরু করেন আমার দারুণ মজা লাগে।’ বস্তুত পেশা নির্বাচন নিয়ে মানুষের প্রতিক্রিয়া সর্বদাই তার কাছে মজার ব্যাপার। কেউ কেউ জানতে চান এতসব জটিল যন্ত্রপাতি সারা সামলান কী করে! বলাবাহুল্য সারা হাসেন। হাতের আঙুল দেখিয়ে বলেন, ‘এগুলো দিয়ে।’

সারা এখন স্পাইসজেট এয়ারলাইন্সে কর্মরত। বোয়িং ৭৩৭ বিমান চালিয়ে তিনি উড়ে যান পুনে-মুম্বই-কোচি পোর্টব্লেয়ার শহরে। প্রায় ১২০০ ঘণ্টা বিমান চালানোর অভিজ্ঞতা তার ঝুলিতে। কিন্তু কেমন ছিল নিজের দুটি ডানার খোঁজ পাওয়ার লড়াইটা? —‘আমি জীবনে বিশেষ কিছু করতে চেয়েছিলাম। আমাদের কলেজে (জ্যোতি নিবাস কলেজ) অস্ট্রেলিয়া থেকে একজন পাইলট কেরিয়ার কাউন্সেলিং করতে এসেছিলেন। তিনিই পাইলট হতে আমায় অনুপ্রাণিত করেন।’

এরপর সারাকে আর পিছন ফিরে দেখতে হয়নি। সারার বাবা হামিদ সাহেবের ফ্লোরিডাবাসী পাইলট-বন্ধু আতিফ ফরিদ বন্ধুকন্যাকে নিয়ে মার্কিন দেশে পাড়ি দেন। সারা ভর্তি হন ফ্লোরিডার বিখ্যাত প্যারিস এয়ার ফ্লাইং স্কুলে। অতঃপর এক বছরের কঠিন প্রশিক্ষণ। পুরোদস্তুর পাইলট হয়ে ওঠার লড়াইয়ে বাবা-মা’র সাহায্যে আর উৎসাহের কথা একবাক্যে স্বীকার করেন সারা। মেয়ে হয়ে জন্মেছেন বলে কী পরিবার কী বহির্বিশ্ব— কোথাও তাকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। কিন্তু সারা বিশ্ব এখন ইসলাম-আতঙ্কে ভুগছে। সারা হামিদ আহমেদ নামটা শুনলেই তো বোঝা যায় মুসলমান। তার জন্যেও কি সারার কোনো বিরূপ অভিজ্ঞতা হয়নি? সারা আবার হাসেন, ‘সত্যি কথা বলতে কী চেন্নাইয়ের মার্কিন কনসুলেটে ভিসার জন্য ইন্টারভিউ দেবার সময় আমি একটু নার্ভাস ছিলাম। সে সময়কার কথা তার মাত্র ৫ বছর আগেই ঘটেছে ৯/১১-র ঘটনা। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমাকে ধর্ম নিয়ে কোনো প্রশ্নই করা হয়নি। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ভিসা পেয়ে গিয়েছিলাম।’

প্রশিক্ষণ শেষ করে বাণিজ্যিক পাইলটের লাইসেন্স নিয়ে দেশে ফিরে এলেন সারা। আর এক প্রস্থ লড়াই শুরু হলো এরপর। সেই সময় পাইলটদের চাকরির বাজারে অসম্ভব প্রতিযোগিতা। চাহিদার তুলনায় জোগান বেশি। আমেরিকান লাইসেন্স থাকা সত্ত্বেও সারাকে স্পাইসজেটের চাকরি পেতে তিন বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ছ’শো লাইসেন্সধারীর মধ্যে মাত্র ৭০ জন নির্বাচিত হয়েছিলেন।

পেশায় ফটোগ্রাফার, সারার বাবা হামিদ সাহেব স্বীকার করলেন, ‘গোড়ায় আমরা ওকে উৎসাহ দিইনি। কারণ আমাদের সমাজে মেয়েরা এমন কোনো পেশায় যায় না সেখানে তাদের বাড়ি থেকে দূরে থাকতে হয়। কিংবা একা হোটেলে থাকতে হয়। কিন্তু ফরিদ আমায় বোঝাল। ওর কথাতেই আমরা সিদ্ধান্ত বদলাই।’ সারার মা নাগিমার অবশ্য কোনো আপত্তি ছিল না। যখন অল্পবয়েসি মেয়েরা সারাকে ঘিরে ধরে পাইলট হবার পথনির্দেশ জানতে চায় তখন গর্বে গর্ভধারিণীর বুক ভরে ওঠে।

আকাশচুম্বী সাফল্য। তবুও জীবনকে শুধু পেশার ভেতরে আটকে রাখতে চান না সারা। তার অন্য স্বপ্নও আছে। ‘আমি বিয়ে করতে চাই। মাও হতে চাই’। ---কিন্তু সঠিক মানুষটিকে খুঁজে পাওয়া সত্যিই মুশকিল। সারা লাজুক হাসেন, ‘যারা আমার ছবি দেখেই তাদের ছেলেদের জন্য আমাকে পছন্দ করে ফেলেন তাদের আমি ঠিক বুঝতে পারি না। কেন যে তারা আমার পড়াশোনা বা পেশা নিয়ে কিছু জানতে চান না কে জানে!’■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ২০০০টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

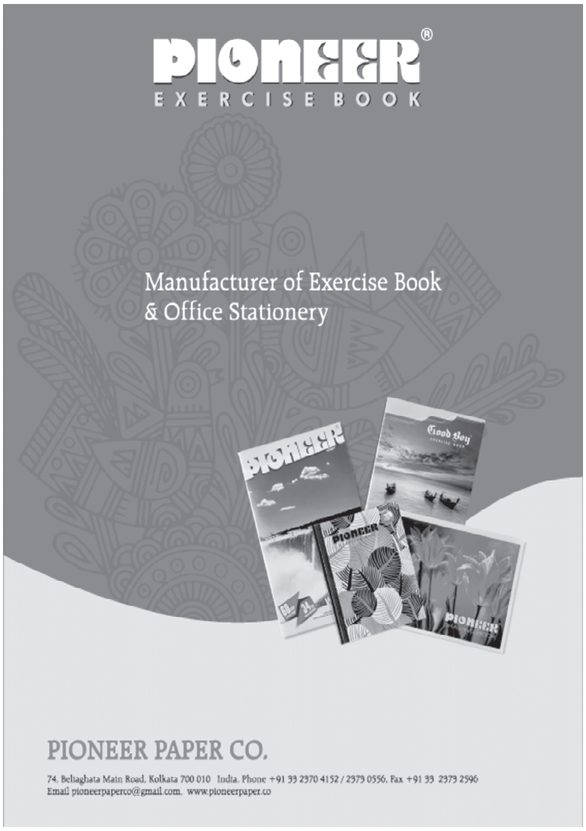

'পাশ্চাত্যদেশীয় লোক শঙ্করাচার্যের মতো এমন এক ব্যক্তির কথা কল্পনাও করতে পারে না। এত অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে কমপক্ষে দশটি ধর্ম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতারূপে নির্বাচিত হওয়া, যার মধ্যে চারটি বর্তমানকালেও পূর্ণ আভিজাত্যসহ বর্তমান, সংস্কৃতে এমন গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করে একটি সম্পূর্ণ পৃথক দর্শন সৃষ্টি করা এবং ভারতীয় পণ্ডিতগণের সম্মুখে নিজেকে শ্রেষ্ঠ হিসাবে প্রতিপন্ন করা— দুইশত বৎসরেও যাকে টলানো যাবে না।'

— *ভগিনী নিবেদিতা*

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

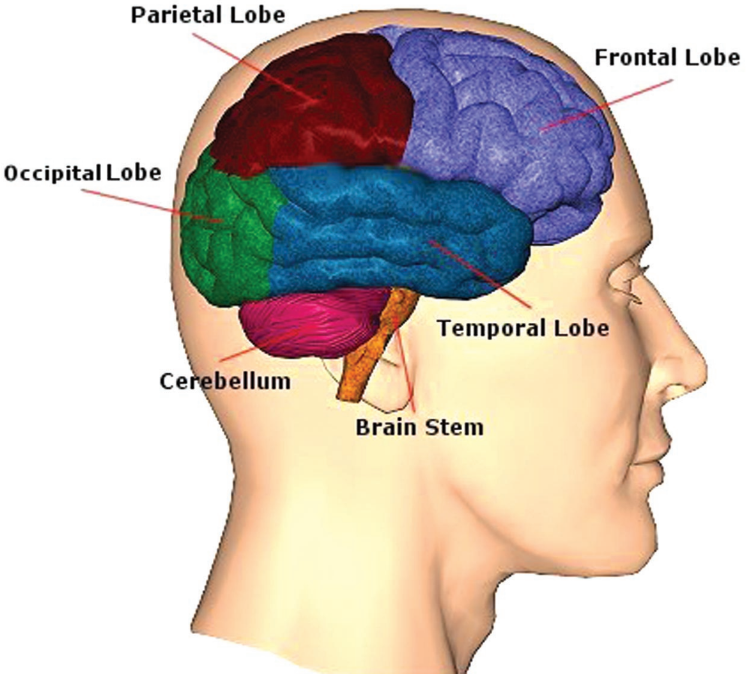

মানুষ খারাপ কাজ করে কেন?

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

মানুষ দুই ধরনের— স্ত্রী ও পুরুষ। আবার কাজের নিরিখেও মানুষকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যাঁরা ভালো কাজ করেন, তাঁরা ভাল মানুষ। যাঁরা খারাপ কাজ করেন, তাঁরা মন্দ মানুষ। কেন মানুষ ভালো কাজ করে, কেনই বা মানুষ খারাপ কাজ করে?

প্রকৃতিগতভাবে মানুষ চায় সুখের অনুভূতি। দুঃখ-বেদনার একঘেয়ে রুটিন থেকে মুক্তি পেতে কেউ কেউ আশ্রয় নেয় কল্পনার জগতে, সৃজনী প্রতিভার বিকাশে ও সৃষ্টির আনন্দে। আবার এই মানুষই অন্যকে আঘাত করে ও সৃষ্টিকে ধ্বংস করে তৃপ্তি পায়। মানুষের দু'টি সত্তা কেন? এর প্রকৃত উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞানের বহু তথ্য ও তত্ত্ব উঠে এসেছে— যার মধ্যে অন্যতম হলো ক্রিমিনাল মাইন্ড ও ক্রিয়েটিভ মাইন্ড তত্ত্ব।

মনোবিজ্ঞানীদের অনুসন্ধান বলেছে, মানুষের দু'টি বৃত্তি— একটি প্রেমাত্মক, অন্যটি ধ্বংসাত্মক। এই বৃত্তির প্রকাশ হয় আচারে-ব্যবহারে। মনোবিদদের মতে, অনুভূতি দেয় আমাদের চিন্তাভাবনা আর সেই অনুভূতি আমাদের যা করায় আমরা তাই করি বা করতে বাধ্য হই।

অপরাধী এবং সৃজনশীল মানুষ দুই তরফই সমাজের কাছে কোনো বার্তা দিতে চায়। এদিক থেকে তাদের চিন্তাভাবনা যেন একই খাতে বয়। কিন্তু উদ্দেশ্যের বিচারে সৃজনশীল মানুষের লক্ষ্য সমাজকল্যাণ আর অপরাধীর হিংসা ও ধ্বংস। শক্তি প্রদর্শন ও সমাজের আইন ভাঙাটাই যেন এদের উদ্দেশ্য।

মনোবিজ্ঞানে এই অনুভূতির গুরুত্ব অপরিসীম। শিশুকাল থেকে বেড়ে ওঠা, মায়ের সান্নিধ্যে থেকে স্বনির্ভর হয়ে ওঠার লড়াইয়ে শিশুকে বৃদ্ধি ও বিকাশের নানা স্তর অতিক্রম করতে হয়। তখন নানা সময়ের নানা অভিজ্ঞতায় কত না সুখ-দুঃখের বিচিত্র অনুভূতি হয় শিশুর মনে। চাহিদা পূরণে সুখ, না হলে কত না অতৃপ্ত কামনা বাসনা তার মনের গভীরে (অবচেতন মনে) জমা হয়। শিশু বোঝে সে সবসময় যা চায় তা পাওয়া অসম্ভব। তার মধ্যে জন্ম নেয় 'বোধ'। এই বোধ তাকে বাস্তবকে মানিয়ে নিতে বা বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গে চলতে শেখায়। শেখে ধৈর্য ও উচিত-অনুচিতের পাঠ। কিন্তু অতৃপ্ত কামনা বা ইচ্ছাগুলো মনের বাইরে চলে যায় না। চাপা পড়ে মাত্র। তাদের ইচ্ছাপূরণের জন্য মন মুখিয়ে থাকে। এই অনিয়ন্ত্রিত মনকে নিয়ন্ত্রণে আনতে শিশুকে শিখতে হয় সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধ ও নৈতিক আচার- আচরণের কিছু মান। যার সূত্রপাত হয় পরিবারে। মনের দু'টি ধারা বাস্তবের সঙ্গে ঠিক তাল মিলিয়ে চলতে পারলেই সমাজস্বীকৃত ও সুবৃত্তি প্রকাশের পথ খুলে যায়।

অতৃপ্ত বাসনা অতি সক্রিয় সেই ব্যক্তির চরিত্রে আনে ভারসাম্যহীনতা। তৈরি হয় বিকৃত ব্যক্তিত্ব। আবার অতি কঠোর নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতেও বাস্তবোধের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষ ঘটে। জন্ম নেয় বিকৃত ব্যক্তিত্বের। যেমন, সমাজবিরোধী ব্যক্তিত্ব, সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তিত্ব, যৌন বিকৃতি বিশেষ করে ধর্ষকামী। শিশুকালের এরকম বহু অতৃপ্ত অভিজ্ঞতায় মানুষের মধ্যে জন্মায় হীনমন্যতা বোধ। এই বোধের ঘাটতি পূরণে কেউ কেউ নিজেদের সত্তাকে অতিরঞ্জিত করে দেখেন। তখন তাদের যা চাই তা চাই-ই চাই। যারা নিজের প্রকৃত সত্তাকে অগ্রাহ্য করে 'আমি'-কে নিপুণ ভাবে চালনা করে তারা সঠিক পথে বৃহত্তরের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে না। তারা

ব্যর্থ এবং বিভ্রান্ত। তাঁদের জন্য খোলা থাকে অনৈতিক ধ্বংসের পথ। নিজের মাহাত্ম্যের উল্লেখই হলো এদের জয়। আবার মিডিয়ার প্রভাবও সোজাসুজি ভাবে পড়ছে মানুষের জীবনে।

পণ্য সামগ্রীর বিজ্ঞাপনে নানা বিকৃত অঙ্গভঙ্গি, শিল্পের নামে ভায়োলেন্স মানুষের মনে আদিম প্রবৃত্তির উস্কানি কাজ করছে। আমাদের চারপাশে নিত্যদিন কত খুনোখুনি মারামারির ঘটনা ঘটছে। আমরা হয়তো জানিই না এর পিছনে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকারের ভূমিকা।

সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তিত্বের মানুষ কেবলমাত্র নিজের ভ্রান্ত বা অলীক ধারণায় অন্যের প্রতি হিংসাত্মক, আক্রমণাত্মক হচ্ছে। এমনকী, অনেকে হত্যা পর্যন্ত করছে। শৈশবে আগুন ধরানো, পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা, একটু বড় হতে না-হতে পড়াশোনা ছেড়ে মদ-গাঁজার ঠেকের খদ্দের হওয়া, নেশার খরচ জোগাতে নানান অপরাধে জড়িয়ে পড়া বা ক্রিমিনাল হয়ে ওঠার রসদ যেমন মনস্তাত্ত্বিক হতে পারে তেমনই এর পিছনে জড়বুদ্ধি ও শিশুর ছোটবেলায় বাবা-মায়ের শাসন পদ্ধতি, সামাজিক পরিস্থিতি, দারিদ্র্যের ভূমিকাও প্রবল হতে পারে।

শৈশবের অভিজ্ঞতা মানুষ ভুলতে চাইলেও পারে না। আর পারে না বলেই তার একান্ত নিজস্ব নৈপুণ্যে সেই অভিজ্ঞতা সমূহ সেজে উঠে ও পরিবেশিত হয়। কিছু শারীরতত্ত্ববিদ বলেন, ব্যক্তির সৃজনশীলতা বা অপরাধপ্রবণতা বংশগত। খেলা বা শরীরচর্চায় বংশ পরম্পরার যোগ্যতা থাকেই। তাঁর জিনঘটিত কারণে মানুষ অপরাধী হয় বলে মনে করেন। চারিত্রিক বৈষম্যের কথা সোজা করে বুঝিয়েছেন প্রখ্যাত ব্রিটিশ প্রাণ-রাসায়নিক ড. লিনে বোদি— 'আমাদের শরীরে যে কোটি কোটি কোষ আছে তার প্রতিটিতে থাকে জীবনের অণু। একে ডিএনএ বা ডি অক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড বলে। কোষের নিউক্লিয়াসে অতি সুরক্ষিত ভাবে থাকে এই রাসায়নিক পদার্থটি এবং সব নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী এটিই। অনেকটা সিঁড়ির মতো দেখতে। বংশপরম্পরায় এটি সন্তানের মধ্যে পরিবাহিত হয়, তাই পিতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই সাধারণত প্রকাশ পায় পুত্রের ভিতর।

আবার স্নায়ু বিজ্ঞানীদের মতে, আমাদের মস্তিষ্কে টেমপোরাল, অক্সিপিটাল ও প্যারাইটাল লোবে ইন্দ্রিয় অনুভূত অভিজ্ঞতা বা তথ্য সঞ্চারের ভাণ্ডার আছে। মস্তিষ্কের অন্য দু'টি অংশ অ্যামিগডালা ও লিম্বিক সিস্টেম হলো আবেগ অনুভূতির কেন্দ্র।

মস্তিষ্কের সামনের অংশ (প্রিফ্রনটাল লোব) হলো বিচার- বিশ্লেষণের জায়গা। আহারিত তথ্য আবেগ-অনুভূতির সঙ্গে মিশে বিশ্লেষিত হয় এবং পরিকল্পনার রূপ নেয়। এটা দেখা গিয়েছে ইতিবাচক আবেগ নার্ভের সংহতি ত্বরান্বিত করে। এখানে একটা প্রশ্ন ওঠে, তবে কি সবই নার্ভের খেলা? তাহলে তো সব শিল্প সব সৃজনীপ্রতিভা একাকার হয়ে যাবে। বস্তুত বিষয়টি সেরকম নয়। সৃজনশীলতার গতিপ্রকৃতি একটু অন্যরকম। এতে থাকে স্রষ্টার 'স্পেশাল টেকনিক' বা নিজস্ব অভিনবত্বের ছোঁয়া। এই অভিনবত্বই কাউকে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি বা পিকাসো বানায়। আবার কাউকে বিস্মরণের অন্ধকারে ঠেলে দেয়।

শরীরতত্ত্ব অনুসারে শরীরে হরমোনের প্রভাব, সীসা দূষণ, মস্তিষ্কে আঘাত বা টিউমার প্রভৃতি বহু কারণে অপরাধীর জন্ম হয়। আবার সমাজ বিজ্ঞানীদের একাংশ ব্যক্তিত্ব বা চরিত্র গঠনে পরিবার ও সমাজের অবদানকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন। অনেকে অপরাধের জন্য মূলত ব্যক্তির শ্রেণী-বৈষম্য ও শ্রেণী সংগ্রামকেই দায়ী করেছেন।

অন্য গবেষকের মতে, মানুষ ক্রিমিনাল হয়ে জন্মায় না, বরং পরিবেশ পরিস্থিতিই তাকে অপরাধী তৈরি করে। অপরদিকে, বংশ পরম্পরার ব্যাপারে পিতার সঙ্গে সঙ্গে মায়েরও অবদান আছে। কারণ পিতার ঔরসে মাতার গর্ভে সন্তান ২৮০ দিন থেকে মানুষ রূপ পায়। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, একজন 'মা' একশো জন শিক্ষকের থেকে বেশি। ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বলেছিলেন— 'তোমরা একশোজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেব।' কারণ একজন মা'ই পারেন তাঁর সন্তানকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে। মায়ের মায়াবী মুখ, আদর, ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা— মায়ের কাছে থেকে পাওয়া আনন্দ ও শিক্ষা, ভবিষ্যতে সুস্থ মানুষ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ■

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিশেষভবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, সরাসরি ব্যাঙ্ক মারফৎ বা মণিঅর্ডার যোগে স্বস্তিকায় টাকা পাঠালে সেই টাকা কী বাবদ পাঠালেন তা সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তিকা দপ্তরকে জানান। গ্রাহকদের টাকা পাঠালে তাঁদের সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা (ফোন নং-সহ) পাঠাতে হবে। অন্যথায় নাম না জানার কারণে আপনাদের পাঠানো টাকার কোনো রসিদ কাটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন গ্রাহকের টাকা পাঠানো সত্ত্বেও যেমন পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না, তেমনই বকেয়া টাকার কারণে কারও কারও পত্রিকা সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচতে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে আপনি যদি ব্যাঙ্ক মারফৎ স্বস্তিকাতে কোনো টাকা পাঠিয়ে থাকেন তাহলে কবে পাঠিয়েছেন, কত টাকা পাঠিয়েছেন এবং কি বাবদ পাঠিয়েছেন অনুগ্রহ করে সত্বর আমাদের জানান। ব্যাঙ্ক মারফৎ টাকা পাঠালে ব্যাঙ্ক যে রসিদ আপনাকে দেয় সেই রসিদের জেরক্স কপিটা আমাদের পাঠালে ভালো হয়।

— ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

সমাজসেবা ভারতী পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২৮ আগস্ট সমাজসেবা ভারতী পশ্চিমবঙ্গের ত্রয়োদশ বার্ষিক সাধারণ সভা কলকাতায় কল্যাণ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৫০ জন সদস্য-সদস্যা সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন শিবদাস বিশ্বাস। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয়

সেবা ভারতীর সহ-সচিব গুরুশরণ প্রসাদ। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন এবং আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন যথাক্রমে সম্পাদিকা শ্রীমতী মুনমুন ঘোষ ও কোষাধ্যক্ষ পিনাকী পাল। সভায় উপস্থিত সদস্যগণ ওঁ-ধ্বনির মাধ্যমে তা অনুমোদন করেন। সভায় ২০১৬-১৭ সালের পরিচালন সমিতি গঠিত হয়। পরিচালন সমিতি নির্বাচনের দায়িত্বে ছিলেন ডাঃ নরেশ চন্দ্র নাগ।

২০১৬-১৭ সালের পরিচালন সমিতি : সভাপতি— বীরেন্দ্র কুমার তেওয়ারী, কার্যকরী সভাপতি— শিবদাস বিশ্বাস, সহ- সভাপতি— অলোক মুখার্জী, সম্পাদিকা— শ্রীমতী মুনমুন ঘোষ, সহ-সম্পাদক— প্রদ্যুৎমল বসু, কার্যালয় সম্পাদক—কমল চ্যাটার্জী, কোষাধ্যক্ষ— পিনাকী পাল, সদস্য— সীতেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, রাজকুমার ঝা, শ্রীমতী কৃষ্ণা পাল, শঙ্কর সরকার, সুশান্ত সেন, শ্রীমতী পাপিয়া চক্রবর্তী।

বড়জোড়ায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জন্মাষ্টমী

প্রতি বছরের মতো এবারও গত ২৫ আগস্ট বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া প্রখণ্ডের বিডিও অফিসের কাছে সাহা লজে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে সাড়ম্বরে জন্মাষ্টমী উৎসব পালিত হয়। বিশ্ব বিন্দু পরিষদের বড়জোড়া প্রখণ্ডের সভাপতি তপন মিশ্রের পরিচালনায় দুপুর ২-৩০ মিনিটে শ্রীকৃষ্ণের পূজারতির মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এদিন শতাধিক ভক্ত-সহ পরিষদের অনেক কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন। পূজা শেষে স্থানীয় বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের ছবিতে রঙ ভরো ও মহাভারতের বিষয়বস্তু নিয়ে ক্যুইজ কনটেস্ট এবং 'কৃষ্ণ সাজো' প্রতিযোগিতা হয়। পরিচালনা করেন শিক্ষক তাপস বেতাল ও চণ্ডীচরণ মণ্ডল। সভায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সম্পর্কে আলোকপাত করেন বাঁকুড়া বিভাগ

সমাবেশ সমাচার

সম্পাদক বলরাম সাঁতরা। এরপর শ্রীমন্ত মণ্ডল এবং বারিদবরণ বিশ্বাসের কণ্ঠে গীত হয় ''আবার বাজও তোমার পাঞ্চজন্য সুদর্শনধারী' গানটি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন হর্ষময় মণ্ডল। এদিন প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানাধিকারীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

ভারতীয় জীবন বীমা নিগম (পূর্বাঞ্চল)-এর উদ্যোগে রাখিবন্ধন

ম্যানেজমেন্ট ও সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে সারাবছর বিভিন্ন বিষয় দাবিদাওয়া নিয়ে একটা দূরত্ব সবসময়ই থেকে যায়, রাখি একমাত্র মাধ্যম যা আবার ম্যানেজমেন্ট ও সাধারণ শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে এক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানিক সু-সম্পর্ক গড়ে তোলে। ফলে উভয়ের এই সামাজিক বন্ধনের প্রভাবে প্রতিষ্ঠান সমৃদ্ধ হয় ও এক সুন্দর কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে গত দু'বছর ভারতীয় জীবন বীমা নিগমের পূর্বাঞ্চল কার্যালয় হিন্দুস্তান বিল্ডিং-এ ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ অনুমোদিত শ্রমিক সংগঠন 'ভারতীয় জীবন বীমা ঠিকা মজদুর সঙ্ঘ (কলকাতা)' মহাউৎসাহের মাধ্যমে রাখিবন্ধন পালন করেন।

জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান

মহিলা সমন্বয় বৈঠক ও আলোচনা সভা

মহিলা সমন্বয় বিভাগের উদ্যোগে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় ৩ সেপ্টেম্বর ভবানীপুর আশুতোষ মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট হলে। উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় মহিলা সমন্বয় সংযোজিকা গীতাতাই গুণ্ডে এবং বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র নির্মাতা ও সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত শম্পা মিত্র।

বিভিন্ন সংগঠনের মহিলা সদস্যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল— রাষ্ট্রসেবিকা সমিতি, সংস্কার ভারতী, বিজেপি মহিলা মোর্চা, বিজেপি দক্ষিণ শহরতলি জেলা কমিটি ও রাজ্য কমিটি, ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের কলকাতা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিজ ওয়ার্কার্স, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এবং জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষণা সঙ্ঘ (এভিআরএস)। সভার প্রথম পর্বে উপস্থিত বিবিধ সংগঠনের মহিলা সদস্যারা তাঁদের কার্যপদ্ধতি, আগামী পরিকল্পনা ও উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানের প্রতিবেদন প্রদান করেন। গীতা গুণ্ডে তাঁর বক্তব্যে মহিলাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও রোজগার এই তিনটি নিত্য আবশ্যিক বিষয়ে মহিলা সমন্বয়ের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল 'মহিলাদের প্রতি সংবাদমাধ্যমের দায়বদ্ধতা'। নিবেদিতা মিশন স্কুল ও সারদা আশ্রমের দশম ও একাদশ শ্রেণীর চারজন ছাত্রী এ বিষয়ে নিজ নিজ বক্তব্য প্রকাশ করে। তাদের মত প্রকাশের মূলবিন্দুটি ছিল সংবাদমাধ্যমে সমাজের সঠিক প্রতিফলন সবসময় হয় না। ভারতীয় সংস্কৃতির মূল নীতি মহিলাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞাপন, দূরদর্শন, ধারাবাহিক ও চলচ্চিত্রে প্রায়শই মহিলা চরিত্রকে কুরুচিপূর্ণ ভাবে প্রদর্শিত করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। নারী যে ভোগ্যবস্তু নয় এটি প্রচার করার দায়বদ্ধতা সংবাদমাধ্যমেরও আছে। বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে এই মহিলারা নানা ভাবে অপমানিত হচ্ছেন, এ বিষয়ে সংবাদ-মাধ্যমকেই সোচ্চার হতে হবে। তবে বাল্যবিবাহের প্রতিবাদকারিণী কিশোরীর কথা প্রচার করার মতো কিছু সদর্থক প্রচেষ্টা সংবাদমাধ্যম করে থাকে।

কিশোরীদের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে শম্পা মিত্র তাঁর বক্তব্যে বলেন, গণমাধ্যমে বা মিডিয়ার কাজ বিষয় জানানো, শিক্ষা দেওয়া ও আনন্দ দেওয়া। মূলত জাতিকে সঠিক দিশা দেখানো। জার্নালিজম একটি মিশন। সুতরাং এই মাধ্যমকে সংযত ও যথাযথ হতে হবে। এর সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন মহিলাদেরও সতর্ক হতে হবে, অর্থ, যশ ও সাফল্যের জন্য নিজেদের সংবাদমাধ্যমের কাছে বিকিয়ে দেওয়া থেকে বিরত হতে হবে। ইন্টারনেট, ফেসবুক ইত্যাদির প্রয়োজনীয় দিকটি গ্রহণ করতে হবে। নাবালিকারা বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে যাচ্ছে এটি মিডিয়া প্রচারের সুফল।

বাংলার মহিলা সমন্বয় সংযোজিকা শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায় আগামী কার্যক্রম হিসেবে ১৯ নভেম্বর কেশব ভবনে ভগিনী নিবেদিতা কেন্দ্রিক একটি অনুষ্ঠানের উল্লেখ করেন এবং আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে ভগিনী নিবেদিতার সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে একটি বৃহৎ মাতৃসম্মেলনের প্রাথমিক পরিকল্পনার কথা জানান। তিনি জানান, আগামী ১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বর কানপুরে মহিলা সমন্বয়ের অখিলভারতীয় বৈঠকে বাংলার প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে শ্রুতিনাটক 'সংকেত' উপস্থাপিত করেন সংস্কার ভারতীর শিল্পীরা, যার মূল বিষয়বস্তু 'লাভ জেহাদ'। অনুষ্ঠানে প্রবীণ কার্যকর্ত্রী মহুয়া ধর, ঋতা চক্রবর্তী, অধ্যাপিকা দীপা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বারুইপুর জেলা কার্যবাহ স্বপন কুমারের মাতৃদেবী অনিমা সাহা গত ১ সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ৩ পুত্রবধূ, ২ কন্যা, ১ জামাতা ও নাতি-নাতনি রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তাঁর পরিবারের সবাই স্বয়ংসেবক। তিনি নিজে এলাকায় সঙ্ঘকাজের প্রেরণাদাত্রী ছিলেন।

শিলিগুড়িতে সারদা শিশুতীর্থ প্রতিষ্ঠা দিবস ও শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন

গত ৫ সেপ্টেম্বর নানা কার্যক্রমের মধ্যে উদ্‌যাপিত হলো শিলিগুড়ি সূর্যসেন কলেজ এবং সারদা শিশুতীর্থের প্রতিষ্ঠা দিবস ও শিক্ষক দিবস তথা ড. রাধাকৃষ্ণন স্মরণ। শিশু ও প্রাথমিক বিভাগের ভাইবোনরা এদিন পুষ্পস্তবক ও ফুল দিয়ে সাজিয়ে তোলে শিশুতীর্থকে। পরে বন্দনা শেষে বৃক্ষরোপণ, স্বচ্ছতায় অংশগ্রহণ করে ভাইবোনরা। উল্লেখযোগ্য যে বিদ্যালয়ের জন্মদিনে তারা উদ্যান সজ্জার প্রয়োজনে নানা রকমের চারাগাছ আনে যা আগামীতে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শোভা বর্ধন করবে। এদিন শিশুদের পরিশ্রুত পানীয় জলের জন্য পাঞ্জাবিপাড়া মাড়োয়ারি সেবা সংস্থার পক্ষে ওম্‌প্রকাশ আগরওয়াল একটি ৮০ লিটার ফিল্টার দান করেন। বিকেলে শিলিগুড়ি স্কুলের আচার্য-আচার্যাগণের উপস্থিতিতে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩৫ জন শিক্ষক শিক্ষিকা-সহ শুভানুধ্যায়ী, সমিতি সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি সমীরেন্দ্র সরকার ড. রাধাকৃষ্ণনের কর্মময় জীবনের ওপর আলোকপাত করেন। বিশেষ অতিথি স্বামী জীবনানন্দ মহারাজ গানের মাধ্যমে শিক্ষককুল তথা ড. রাধাকৃষ্ণনকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। প্রবীণ ব্যক্তিত্ব শ্রীজীব ভট্টাচার্য রাষ্ট্রগঠনে শিক্ষক-শিক্ষিকার ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। ভূতপূর্ব প্রধানাচার্য বিমলকৃষ্ণ দাস বিদ্যাভারতী ও শিশুতীর্থের বিষয়ে স্মৃতিচারণ করেন।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয় পরিচালক সমিতির সম্পাদক বিজয় কুমার শাহ্। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ৪ জন প্রবীণ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কার্যকরী প্রধানাচার্য অনিরুদ্ধ দাস।

গঙ্গারামপুর শিশুমন্দিরে কৃষ্ণসাজো শোভাযাত্রা

গত ২৫ আগস্ট ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে সরস্বতী শিশু মন্দিরের পক্ষ থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এই শোভাযাত্রায় চারশো ভাইবোন কৃষ্ণ সেজে অংশ নেয়, সঙ্গে তিনশো মা এবং অভিভাবক মিলে মোট এক হাজারজনের এক বিশাল শোভাযাত্রা গঙ্গারামপুর শহর পরিক্রমা করে। কৃষ্ণের বাল্যকালের ঘটনা সংবলিত দুটি ট্যাবলো জনগণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গঙ্গারাম সঙ্কুল প্রমুখ বলরাম দাস এবং পরিচালন সমিতির সভাপতি অনিল বিশ্বাস।

মঙ্গলকোটে বলরাম জয়ন্তী

গত ৭ আগস্ট বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের কৈচরে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের উদ্যোগে কৃষ্ণদেবতা ভগবান বলরাম জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের ১৪৭ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ-সভাপতি অজিত বারিক অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-বিভাগ প্রচারক অর্জুন মণ্ডল উপস্থিত ছিলেন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

শব্দরূপ-৮০৫ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

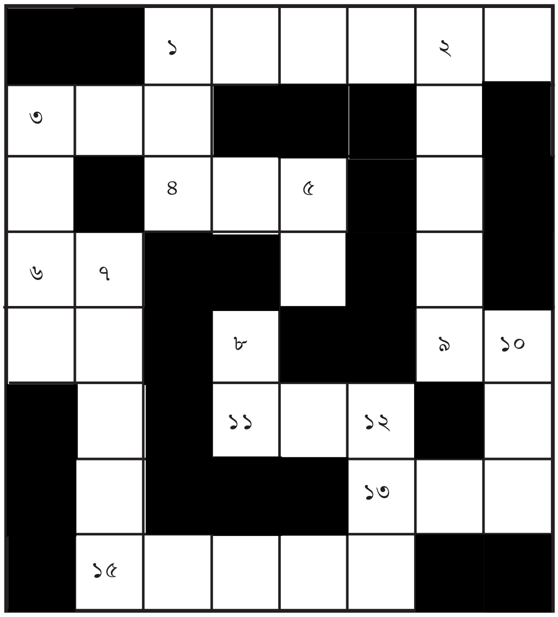

সূত্র :

পাশাপাশি : **১.** ভুবনেশ্বর তীর্থের প্রাচীন নামান্তর; শেষ তিনে অরণ্য, **৩.** স্ত্রী জাতীয় বকপক্ষী; বকী, **৪.** শসা, ক্ষীরা, **৬.** ‘‘বনে থাকে—, গাছে থাকে পাখি’’, **৯.** আগুন জ্বালার শব্দ (‘---করে জ্বলে ওঠা’), **১১.** কুবেরের আকাশগামী রথ, **১৩.** লক্ষ্মীপতি, নারায়ণ, **১৪.** অকর্মণ্য, মূর্খ (মূল অর্থে, অকালে জাত কুষ্মাণ্ডের তুল্য)।

উপর-নীচ : **১.** কানি; মনসাদেবী, **২.** নদীয়াচন্দ্র শ্রীগৌরচন্দ্র, **৩.** পুরাণোক্ত অগ্নিমুখী সমুদ্র ঘোটকী, **৫.** মেখলা, কটিভূষণ; দক্ষিণাত্যের নগর---বিশেষ, অধুনা কাঞ্জিবরম, **৭.** ঘামাচি, **৮.** বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্ট কল্পনাপ্রবণ শিশুচরিত্র, **১০.** ‘‘এসেছে শরৎ, হিমের—লেগেছে হাওয়ার পরে’’, **১২.** ফুলের সাজি, ঝাঁপি।

সমাধান
শব্দরূপ-৮০২
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
সুশীল কয়াল
কলকাতা-৬

না	ল	ক		জ	য়	দে	ব
র		ল		ম			ল্ক
দ		ম	গ	জ			ল
		দা		ম	তি		
		ন	ব		ল		
উ			ল	প্সি	কা		উ
দ্ধ			দে		ঞ্চ		ষ্ণী
ব	সু	দে	ব		ন	হু	ষ

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন ‘শব্দরূপ’।

৮০৫ সংখ্যার সমাধান আগামী ৭ নভেম্বর ২০১৬ সংখ্যায়

প্রেরণার পাথেয়

গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, ক্ষমতার অধিকার বাস্তবে কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য কোনো কিছু উপভোগ করার হাতিয়ার মাত্র। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই অধিকারে পরিবর্তন হতে থাকে। সেজন্য আমাদের ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে অধিকারের বিতর্কে পড়া উচিত হবে না। ভারতবর্ষে সমাজের কেবল একটিই স্বরূপ, তা দেশ— এরকম মনে করা হয় না। ব্যক্তি, পরিবার, বংশ, জাতি, দেশ ইত্যাদি অনেকরূপে সমাজ অভিব্যক্ত হয় এবং তার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ব্যক্তির মধ্যে সমাজহিতের ভাবনা বহমান থাকুক, সেজন্য ভারতবর্ষে পরিবারকে একটি ব্যবহারিক একক হিসেবে রাখা হয়েছে। এতে প্রত্যেক ব্যক্তি উপার্জন করার অধিকারী, কিন্তু অর্থের মালিকানা থাকে পরিবারের হাতে। সম্পদের ব্যবহার পরিবারের হিতের জন্য করা হয়, যা খুশি তাই করার জন্য নয়। ট্রাস্টিশিপের এই ভারতীয় ভাবনা গান্ধীজী, শ্রীগুরুজী প্রমুখ মহাপুরুষ সমাজের সামনে রেখেছেন।

* * *

শিল্পের সঙ্গে মেশিনের সম্পর্ক। তার ব্যবহার আমাদের খুব ভেবেচিন্তে করতে হবে। বাস্তবে এর ব্যবহারের পরিণাম অন্য সব উপকরণের ওপর পড়ে। যদি মেশিন যোগ্য হয় তবেই আমরা শ্রমিককে শ্রমিকের সংজ্ঞা দিয়ে তাদের উৎপাদক তৈরি করতে পারি, অন্যথায় তারা কেবল উপভোক্তা হয়েই রয়ে যাবে। যে বলদ লাঙ্গল টানার উপযুক্ত তা ট্রাক্টর টানার কাজে ব্যবহার করলে ভুল হবে। সাধারণ বুদ্ধিতে বলা যায়, নিজের দেশে উপলব্ধ উৎপাদন-উপকরণের সঙ্গে খাপ খায় এমন মেশিন আমাদের ব্যবহার করতে হবে। শ্রম ও শক্তি, পুঁজি ও ব্যবস্থা। মাল ও চাহিদা— এসব অনুযায়ী মেশিন নির্বাচন করতে হবে। এসবের পরিবর্তনের কারণেই মেশিনের আবিষ্কার হয়েছে। প্রবাদ আছে— ‘আবশ্যকতা আবিষ্কারের জননী’। কিন্তু আজ মেশিনকে ধ্রুবসত্য মনে করে সে অনুসারে বাকি সবের চিন্তা করছি। মেশিনের জন্য মানুষকে বদল করতে বাধ্য হয়ে পড়ছি। সমস্ত উৎপাদনব্যবস্থা মেশিনে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে। আজ আবিষ্কার আবশ্যকতাকে নির্মাণ করে চলেছে।

(পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ব্যক্তি-দর্শন থেকে)

।। চিত্রকথা।। রাসবিহারী বসু।। ৮

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪২৩

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবার সঙ্গে ভাগ করে পড়ার মতো

উপন্যাস

শেখর সেনগুপ্ত - **সমুদ্ভাবিত অনুত্তম**
সুমিত্রা ঘোষ - **শিরিণ**
জিষ্ণু বসু - **আমি মাধবী চট্টোপাধ্যায় বলছি**

গল্প

রমানাথ রায় - **ভালোবাসার রকমফের**
শেখর বসু - **অন্তরালে**
এষা দে - **একতলার বাসিন্দা**
প্রবাল চক্রবর্তী - **দানবোত্থা ভবিষ্যতি**
গোপাল চক্রবর্তী - **দেশান্তর**

রম্যরচনা

সুন্দর মৌলিক - **চীনের চাউমিন আমাদের চাউমিন**

ভ্রমণ কথা

কুণাল চট্টোপাধ্যায় — **চীন থেকে ফিরে**

চরিতকথা

জহর মুখোপাধ্যায় — **স্বামীজীর চারতীর্থে কুমারী পুজো**

ইতিহাস

সৌমেন নিয়োগী - **সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ এক স্থাপত্য— তালকাড**

খেলা

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় - **বিশ্বশ্রীর মন্দিরে বেহাল দশা**

প্রবন্ধ

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস - **মীরা পঞ্চশতী**
ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী - **শকাব্দ : ভারতের নিজস্ব জাতীয় কালপঞ্জী**
ড. প্রণব চট্টোপাধ্যায় - **ভগিনী নিবেদিতা ও সরলাদেবী চৌধুরানি**
ড. তুষারকন্তি ঘোষ - **উত্তরবঙ্গের ভারতভুক্তি আন্দোলনের এক বিস্ময়কর কাহিনি**
দেবীপ্রসাদ রায় - **আইনস্টাইনের ঈশ্বর ও ধর্মভাবনা এবং বেদান্ত**
অমলেশ মিশ্র - **বিশ্বের প্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগর**
রবিরঞ্জন সেন - **মহারাষ্ট্রের ভক্ত-কবি পরম্পরা ও মারাঠা জাতীয় জাগরণ**
রজত পাল - **ঋকবেদ ও জেন্দ আবেস্তা**
অরিন্দম মুখোপাধ্যায় - **ছিন্ন তমসুকের কাহিনি**
অর্ণব নাগ - **রঘু ডাকাত : রূপকথায় ও বাস্তবে**

চরিতকথা

জহর মুখোপাধ্যায়- **স্বামীজীর চার তীর্থে কুমারী পুজো**

বিনোদন

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় - **অবিস্মরণীয় কমেডিয়ানরা**

নবাঙ্কুর (ছোটদের বিভাগ)

সিদ্ধার্থ সিংহ - **অমরত্ব**
বিরাজ নারায়ণ রায় - **মহাদেবের ষাঁড়**
শান্তনু গুড়িয়া - **শব্দরূপ**। শৌনক রায়চৌধুরী - **ধাঁধা**

সত্বর প্রয়োজনীয় কপি বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা

पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना नवीनीकरण एवं नये आवेदन

जनसंपर्क संचालनालय द्वारा वर्ष 2015 में एक वर्ष के लिए स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी से दो चरण में करवाया गया था। द्वितीय चरण की पालिसी 4 अक्टूबर, 2016 को समाप्त हो रही है। नवीनीकरण के आवेदन और नये आवेदन निर्धारित प्रीमियम के ड्राफ्ट के साथ 16 सितम्बर 2016 तक जनसम्पर्क संचालनालय/संभागीय/जिला जनसम्पर्क कार्यालयों में देना आवश्यक है। प्रीमियम की तालिका निम्नानुसार है :–

प्रीमियम तालिका

आयु	मूल प्रीमियम स्वास्थ्य बीमा	प्रीमियम दुर्घटना बीमा	कुल प्रीमियम	25% प्रीमियम पत्रकार की ओर से (स्वयं)	75% सरकार की ओर से	स्वयं + पति/पत्नी	स्वयं + पति/पत्नी + एक बच्चा	स्वयं + पति/पत्नी + 2 बच्चे	स्वयं + पति/पत्नी + 3 बच्चे
21-35	2964	350	3314	829	2485	1168	1507	1845	2184
36-45	3574	350	3924	981	2943	1390	1798	2207	2615
46-55	5466	350	5816	1454	4362	2078	2701	3324	3948
56-60	7456	350	7806	1952	5854	2802	3653	4503	5354
61-70	10151	350	10501	1575*	8926**	2732	N.A.	N.A.	N.A.

* प्रीमियम की गणना 15% के आधार पर की गई है। ** प्रीमियम की गणना 85% प्रतिशत के आधार पर की गई है।

पात्र नये पत्रकार भी आवेदन कर सकेंगे

- व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा ₹ 2 लाख और दुर्घटना बीमा ₹ 5 लाख का होगा। 21 से 70 वर्ष तक की उम्र के संचार प्रतिनिधि इसके पात्र होंगे।
- बीमा एक साल के लिये किया जायेगा। 60 वर्ष तक के संचार प्रतिनिधि की वार्षिक बीमा किश्त का 75% और 61 से 70 वर्ष के संचार प्रतिनिधियों के बीमा किश्त का 85% जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा दिया जायेगा।
- पति, पत्नी या बच्चों को भी निर्धारित प्रीमियम देने पर, योजना में शामिल किया जा सकेगा।
- जनसंपर्क संचालनालय की अधिस्वीकृति प्राप्त पत्रकारों के साथ ही बिना अधिस्वीकृति प्राप्त पत्रकारों के लिए जो संस्था द्वारा देय फार्म 16 जिसमें पी.एफ. नम्बर का स्पष्ट उल्लेख हो अथवा पी.एफ. कटौती का प्रमाण–पत्र संलग्न करेंगे उन्हें भी योजना में शामिल करने के प्रावधान किये गए हैं।

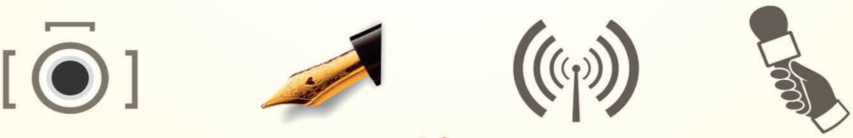

संपर्क

पत्रकार कल्याण शाखा
जनसंपर्क संचालनालय
भोपाल

एस. जॉन, नोडल अधिकारी
(M) 9009212713
E-mail : johnunitedbpl@gmail.com

जे.के. सबलानिया, डिवीज़न मैनेजर
Email : jitendrasablania@uiic.co.in
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमि.,
डिवीज़न कार्यालय–II, 153, गुरु आर्केड,
प्रथम तल, जोन–1, एम.पी. नगर, भोपाल
मोबाइल नं. : 9425015735

आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 16 सितम्बर, 2016

नोट : यदि पत्रकार अपने परिवार के सदस्य/सदस्यों को भी योजना में शामिल कराना चाहते हैं तो ऊपर तालिका में दर्शाये गए आयु वर्ग के अनुसार प्रीमियम राशि को जोड़कर कुल प्रीमियम का भुगतान यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को ड्राफ्ट द्वारा किया जाए।
बीमा पॉलिसी की विस्तृत जानकारी www.mpinfo.org और www.mdindiaonline.com पर उपलब्ध है।
वेबसाइट से फार्म डाउनलोड कर प्रीमियम के अंश के साथ जनसंपर्क संचालनालय अथवा संभागीय/जिला जनसंपर्क कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश सरकार

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

Published by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6 and Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. E-mail : swastika5915@gmail.com।। দাম ১০ টাকা।।